বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

কলকাতার জলাভূমি
উত্তরকাশীর ভূমিকম্প এবং বাঁধ বিকল্প
সুন্দরবন সার কারখানা
ভূপাল এখন
শ্রীরামপুরের বন্ধ পেনিসিলিন কারখানা

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত — চতুর্দশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা — মে-জুন 1991 — দাম দু টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মে-জুন 1991 ★ চতুর্দশ বর্ষ ★ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচী

* আক্রান্ত জলাভূমি 2
* জলা নিয়ে টালবাহানা 7
* জলাভূমির মুখোমুখি 8
* সাম্প্রতিক ভূমিকম্প 10
* ভূপাল এখন 13/14
* উন্নয়ন পরিবেশ ও শিল্পায়ন 15
* সুন্দরবন ফার্টিলাইজারে গুলি চালনা 17/18
* স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্—
  এখন যা ঘটছে 21
* মানসের দশ বছর 23

গ্রাহক পাঠকদের প্রতি

কিছুতেই বি ও বি-র প্রকাশ-কে ঠিক সময়ে আনা যাচ্ছে না। মে-জুন '91 সংখ্যা বেরোল ফেব্রুয়ারী '92-এ। এ ব্যাপারে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পুরোন গ্রাহকরা অনুগ্রহ করে সময়মত রিনিউ করিয়ে এবং নতুন গ্রাহক তৈরী করে আমাদের সহযোগিতা করুন। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। বাৎসরিক চাঁদা মাত্র বারো টাকা, সডাক পনের টাকা।

ব্যাঙ্ক ড্রাফট / মানি অর্ডার পাঠাবার/যোগাযোগের ঠিকানা :

প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী, বি 2, বৈশাখী, 153/1 যশোর রোড,
কলকাতা-700074 ফোন : 59-6357

পড়ুন ও পড়ান

উৎস মানুষ, গণবিজ্ঞান সমন্বয় বুলেটিন, বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান দিশারী, বিজ্ঞান মঞ্চ বুলেটিন, নাগরিক মঞ্চ বুলেটিন, মানুষী, অন্বেষণ।

যে সব স্টলে বি ও বি পাবেন

উৎস মানুষ স্টল (2, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট), শিয়ালদহ মেন স্টেশন, পাতিরাম (কলেজ স্ট্রীট), সুকিয়া স্ট্রীট, ব্যারাকপুর স্টেশন, খাদি গ্রামোদ্যোগের সামনের স্টল (গড়িয়াহাট), নির্মাণ বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন (10এ, পার্শিবাগান লেন), ইত্যাদি।

এবার যাঁরা কাজ করেছেন

কম্পোজ—গীতশ্রী সেন, দুলাল বোস, গোপাল ঘোষ, স্বপন সেন
মেক্‌আপ—স্বপন সেন
মেশিনম্যান—স্বপন খাঁ
বাইণ্ডিং—লক্ষ্মণ দাস
মুদ্রক—পূর্ণেন্দু বিশ্বাস
সম্পাদনায়—রবীন চক্রবর্তী
সাহায্য করেছেন—শেখর, অসীম, স্বাতী, সত্যব্রত এবং অন্যান্য বন্ধুরা

বেদনায় যন্ত্রণায় ক্রোধে অসহায়তায়

আমরা স্মরণ করি
দুটি মৃত্যু.....

আঠাশে সেপ্টেঃ—উনিশ'শ একানব্বই

মানুষের মত মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার এক উজ্জ্বল চেষ্টা, ছত্রিশগড়ের লোহাখনি অঞ্চলের নারী-পুরুষের মিলিত প্রয়াসকে স্তব্ধ করতে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করা হয়েছে **শঙ্কর গুহ নিয়োগীকে**। আজকের দুস্থ সময়েও ছত্রিশগড়ের খনি মজদুররা যে পরিচ্ছন্ন সতেজ আন্দোলন ও সমাজ-জীবন গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন তার সব কিছুর মধ্যেই শংকর ছিলেন গভীর ভাবে। ন্যায্য মজুরীর লড়াই থেকে শুরু করে শহিদ হাসপাতালের মত বিকল্প উদ্যোগ অবধি সর্বত্র শংকর ছিলেন, রয়েছেন, থাকবেন।

তেরই জানুঃ—উনিশ'শ বিরানব্বই

আঠাশ বছরে পা রাখার আগেই হাসি-খুশি প্রাণবন্ত যুবক **সিদ্ধার্থ গৌতম** চলে গেল এক ভোরবেলা। আজকের সমাজে যারা নির্যাতিতদের মধ্যেও সবচেয়ে নীচের তলায় সেই এইডস-আক্রান্ত, পেশাদারী রক্তদাতা আর সমকামিদের নিয়ে এক বন্ধুত্ব আর ভালবাসার জগত গড়ে তুলেছিল হজকিন্স রোগ আক্রান্ত সিদ্ধার্থ। এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এইসব মানুষদের মর্যাদা ও অধিকারের জন্য তার প্রবল চেষ্টার উষ্ণতা কিছুতেই ফুরিয়ে যেতে পারে না।

এই লেখাটি যৌথ প্রয়াসের ফসল। অনেকগুলি সংস্থার বন্ধুদের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে একটি বুকলেট—'আক্রান্ত জলাভূমি'। আমরা সেই বুকলেটের রসদ কেটে-ছেঁটে পত্রিকার মাপে করে নিয়েছি। —সঃ মঃ

আক্রান্ত জলাভূমি

পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি ছিল—এখনও আছে!

এখন থেকে পঁচাত্তর বছর আগে বেলেঘাটা থেকে বেলগাছিয়া অবধি যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে পূব দিকে তাকালে চোখে পড়ত বিশাল এক জলাভূমি—পূব, দক্ষিণ-পূব আর উত্তর-পূব জুড়ে। এখন সে জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা যাবে কেবল সারি সারি ঘরবাড়ী। বেলগাছিয়া, পাতিপুকুর, শ্রীভূমি, লেকটাউন, বাঙ্গুর জুড়ে। তৈরী হয়েছে উঁচু ভি আই পি রোড। তারপরে আজকের বিধান নগর বা সল্ট লেক। এই বিধান নগরের শেষ সীমানায় তৈরী হয়েছে সাড়া জাগানো শিশু উদ্যান ঝিলমিল বা নিকো পার্ক। এই নিকো পার্কের প্রান্তে এসে দাঁড়ালে চোখে পড়বে সেই বিশাল জলাশয়ের পড়ে থাকা অংশ। পুরনো লবণ হ্রদ। যে জলাশয়কে এখন গ্রাস করতে উদ্যত শহর কলকাতা। তাই নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়েছে। কেন এই হৈচৈ—জানতে, গিয়েছিলাম ওই এলাকাতে। তার ভিত্তিতে রচিত এই প্রাথমিক প্রতিবেদন।

ঝিলমিল-নিকো পার্ক-এর গায়েই হল নলবন ভেড়ি। তারপর গায়ে গা লাগিয়ে ডান থেকে বাঁদিকে সুকান্তনগর ভেড়ি, চার নম্বর ভেড়ি, সর্দার ভেড়ি, চকের ভেড়ি, নারকেলতলা ভেড়ি, চিন্তা সিং, মুন্সীর ভেড়ি, মোল্লের ভেড়ি। আর পরের লাইনে নাটার ভেড়ি, সাহেব মারা ভেড়ি, গোপেশ্বরের ছোট ও বড় ভেড়ি আর ছোট পরেশ ও বড় পরেশ ভেড়ি। এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পরের পর ভেড়ি। এই পুরো অঞ্চলটাকেই আগে বলা হত লবণ হ্রদ—এখন বলে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি। ভি আই পি রোডের পর থেকে এই জলাভূমির চার ভাগের এক ভাগ বুজিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিধান-নগর বা সল্ট লেক মহানগরী।

একজন ভেড়ি শ্রমিকের সঙ্গে আলাপ হলে তিনি জানালেন,—"জানেন, এই জলাভূমিতে আমরা প্রায় আঠেরো হাজার লোক বাস করি। কলকাতার বাবুরা অনেকেই এখবর রাখেন না। তারা ভাবেন এ অঞ্চলটাতে কিছুই নেই—কেবল নোংরা আর নোনাজলের মজে যাওয়া কিছু খাল-বিল-ডোবা। অনেকে বলেন রোগের জীবাণু তৈরি করা আর মশার চাষ করা ছাড়া এই জায়গাটার আর কোনো কাজ নেই। বাবুদের মতে এ অঞ্চলটা মাটি ফেলে বুজিয়ে দেওয়া উচিত।"

সে অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা

উত্তরে দমদম থেকে দক্ষিণে সোনারপুর পর্যন্ত অঞ্চলটাতে বহু কাল ধরেই এই লবণ হ্রদ আছে। 1704 সালে কলকাতার ওপর ইংরেজদের লেখা প্রথম বইতেও সে খবর পাওয়া যায়।

এর নোনা জল সমুদ্র থেকে মাতলা, পিয়ালি, বিদ্যাধরী নদী হয়ে এই অঞ্চলে এসে পৌছত। জোয়ারের সময়ে জলে ভরে উঠত লবণ হ্রদ—ভাঁটার টানে জল ফিরে যেত সাগরের দিকে। সারা অঞ্চলে বিদ্যাধরী নদীর অনেকগুলো শাখা ছিল। এগুলোতে জলও থাকত সারা বছর। কলকাতা থেকে সুন্দরবন এমন কি যশোর, খুলনা যাতায়াত করত বণিকেরা এই লবণ হ্রদের মধ্যেকার নদীপথ দিয়েই।

সমুদ্রের নোনা জল লবণহ্রদে বয়ে নিয়ে আসত নানা ধরনের মাছ যেমন গলদা চিংড়ি, বাগ্‌দা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, পারশে, ভাঙ্গর, ভেট্‌কি, গুরজাওলি ইত্যাদি। এ অঞ্চলের মানুষ ছোট-ছোট বাঁধ দিতে শুরু করলেন লবণ হ্রদের বিভিন্ন অংশে। তার ফলে জোয়ারের জল মাছ-সমেত ঢুকে পড়ত নোনা ভেড়িগুলোতে। কিন্তু ভাটার টানে অনেকটা জল বেরিয়ে গেলেও মাছগুলো আটকা পড়ে যেত ভেড়ির অল্প জলেই। এ অঞ্চলে মাছ চাষ মোটামুটি এ ভাবেই শুরু হয়।

লবণহ্রদে নোনা জল আসা বন্ধ হল

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী জোয়ার-ভাঁটার তালে তালে বিদ্যাধরী হয়ে লবণহ্রদে নোনা জলের যাতায়াত চলছিল। বাদ সাধল মানুষ আর কলকাতা-শহরের ফুলে ফেঁপে ওঠা।

কলকাতা শহরের তিনপাশ ঘিরে যে সমস্ত নিকাশী খাল দেখতে পাওয়া যায় সবই তৈরী হয়েছে স্বাধীনতাপূর্ব কালে। যেমন টালির নালা 1775 সালে, বেলেঘাটা খাল 1810 সালে, সার্কুলার খাল 1830 সালে, নিউকাট খাল 1859 সালে, ভাঙ্গর কাটা খাল 1898 সালে এবং সর্বশেষ কেষ্টপুর খাল 1910 সালে। একটা খাল বুজিয়ে রাস্তা হয়েছে—সেটা হল সার্কুলার রোড।

সেই 1875 সাল থেকেই কলকাতা শহরের বৃষ্টির জল আর নোংরা

জলাভূমি ভরাট হলে গৃহহারা হবেন কুড়ি হাজার পরিবার

জল হুগলী নদীতে ফেলা হত না—ফেলা হত বিদ্যাধরীতে। ভাঁটার টানে বিদ্যাধরীই তা টেনে নিয়ে যেত সাগরে। প্রায় তিরিশ বছর ধরে এ ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলেছিল। তারপরেই দেখা দিল বিপদ। জোয়ারের সাথে সাগর থেকে বয়ে আনা পলি আর শহরের নোংরা জলে মিশে থাকা ময়লা জমতে থাকল বিদ্যাধরীর বুকে। নদীর গভীরতা কমতে থাকল।

1918 সালে বিদ্যাধরীকে বাঁচানোর প্রথম ও শেষ চেষ্টা শুরু হল। নদীর বুক থেকে পলি তুলে গভীরতা বাড়ানর চেষ্টা চলল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। কিন্তু ততদিনে বোধ হয় বড্ডো দেরী হয়ে গেছে। 1928 সালে সরকারীভাবে বিদ্যাধরীকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করা হল। সাগরের জল ঢোকা বন্ধ হল—লবণহ্রদ থাকল শুধু নামেই নোনা!

বিদ্যাধরী বুঁজে যাওয়ার পর প্রযুক্তিবিদ্ বি এন দে মহাশয়ের পরিকল্পনা মত কলকাতার ময়লা জল 28 কিলোমিটার দীর্ঘ একজোড়া নতুন কাটা খাল মারফৎ কুলটি নদীতে নিয়ে ফেলা হচ্ছে।

নোংরা জলের ভেড়ি থেকে মিঠে জল

"জানেন, কলকাতার যে ড্রেন, কাঁচা নর্দমা দেখেন—সেই সবের জল আমরা দুবেলা দুহাতে ঘাঁটি। চারদিকে যত জল দেখছেন ভেড়িগুলোতে, সবই তো আসছে শহরের বাথরুম, পায়খানা, রান্নাঘর, রাস্তাঘাট থেকে নর্দমা বা ড্রেন বয়ে। এই জলে আমরা ডিম ছাড়ি, মাছ বড় করি, জাল টানি, আর শহরের বাজারে জ্যান্ত ছট্‌ফট্ করা চারাপোনা, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, সিলভার কার্প চালান দিই। তারপর ভেড়ি ঘুরে সেই নোংরা জল যখন শেষে কেষ্টপুর বা বানতলা খাল হয়ে কুলটিতে গিয়ে পড়ে—সেই কালো জল হয়ে যায় ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার!" জানিয়েছিলেন চার নম্বর ভেড়ির এক শ্রমিক।

কলকাতার পাশের ময়লা জলের এই প্রাকৃতিক পরিশোধন পদ্ধতি উঠে গেলে তার বদলে বসাতে হবে যান্ত্রিক পরিশোধনাগার। মেকানিকাল ট্রিটমেণ্ট প্ল্যান্ট। বেশ কয়েকটি আমাদের দেশেও আছে। অধিকাংশই ঠিকমত চলে না, আর কয়েকটা একেবারেই চলে না। এই ভেড়ি এলাকাতেই একটা দৃষ্টান্ত আছে বানতলায়। ভারতবর্ষের বৃহত্তম সেডিমেণ্টশন ট্যাঙ্ক। নিশ্চল, নিথর। শয়ে শয়ে সচল ভেড়ির মাঝখানে মহাস্থবিরের মত পড়ে আছে অচল যন্ত্র-দানব।

সত্যি, ভাবতে অবাক লাগে যখন জানতে পারি যে কলকাতার মাপের অন্যান্য শহরগুলো ময়লা, নোংরা জল শহর থেকে বের করে দেবার জন্যে কোটি-কোটি টাকা খরচ করে থাকে। মাইলের পর মাইল লম্বা বিশেষ ধরনের পাইপ, বড় বড় যন্ত্র আর বড় বড় কারখানা তৈরি করতে হয় শহরের নোংরা জল পরিষ্কার করতে।

মনে মনে হিসেব মেলাতে গিয়ে বেশ জোরেই বলে ফেললেন এক বন্ধু —"মানে, একদিকে শহরের নোংরা জল পরিষ্কার কর বাবদ কোটি কোটি টাকা বছরে বাঁচছে—অন্যদিকে নিজেদের কাজ আর তাজা মাছ বাবদ কোটি কোটি টাকা বছরে আয় হচ্ছে। এত লাভজনক শিল্প তো বোধহয় আমাদের দেশে খুব একটা নেই? শুনি তো পশ্চিমবঙ্গেই 30 হাজার বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্প রুগ্ন হয়ে ধুঁকছে! তাহলে এমন লাভজনক একটি প্রকল্প বন্ধ করা কার স্বার্থে?

চেনা-চেনা সুর

"সেই যখন বিদ্যাধরী দিয়ে নোনা জল আসা বন্ধ হয়েছে—তারপর থেকেই কলকাতা শহরের নোংরা জলের একটা অংশ ফেলা শুরু হোলো এই লবণ হ্রদে। তখনই এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল 'বিদ্যাধরী স্পিল্ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি'। এখন যেখানে বিধাননগর, সেখানকার 20-25টা ছোট-বড়-মাঝারি ভেড়ি মিলিয়ে প্রায় 2500 শ্রমিক এই সমবায়ের মধ্যে ছিলেন। অত বড় সমবায় নাকি গোটা এশিয়ায় তখন ছিল না। জানেন, ভারতবর্ষের সেরা সমবায় ছিল এটা। প্রাইজও পেয়েছিল সে যুগে। সে সময়কার কয়েকজন মৎস্যজীবির আজও দেখা পাবেন দত্তাবাদ অঞ্চলে ই এম বাইপাসের ধারে।" সুকান্তনগর ভেড়ি সমবায় সমিতির অফিসঘরের সামনে বসে আমরা শুনছিলাম সেই সব দিনকার কথা—কীভাবে চলত সে সময়কার রমরমা সমবায়। 1958 সালে যখন বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে বিধান রায় লবণহ্রদ ভরাট করাবার কাজ শুরু করালেন—ভেড়ি শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বিধান রায় প্রথমে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই চাননি—শেষে বাধ্য হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এখানে এত লোক থাকে, আমাকে কেউ বলেনি তো?" তারপর বলেছিলেন যে, চুক্তিমত দিনে 50 লক্ষ টাকা করে বিদেশীদের দিতে হবে ফলে কাজ বন্ধ করা যাবে না। তবে যাঁদের সরে যেতে হচ্ছে তাঁদের দিকটা তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন। —"বিধান রায়-এর সরকার সে সময়ে বলেছিল, ঘর দেবে মাছ চাষের ভেড়ির কাছেই, যেখানে তারা ভেড়ি শ্রমিক হয়েই থাকতে পারবে—আরো কত কী? কিন্তু কি পেয়েছি? বিধাননগর তৈরির সময়ে জন-মজুরের কাজ করেছি। বাড়ির বৌ-ঝিরা এখন বাবুদের বাড়ি বাসন মাজছে—এই তো সব কথার দাম!"

পুরোনো ছবি, চেনা ছবি, নতুন হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। কী যুক্তি!—কয়েক হাজার মানুষকে কয়েক লক্ষ মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে। নর্মদা, বালিয়াপাল, টেহরী, ভোপাল, কোয়েল-কারো, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি—একের পর এক চলছে উন্নতির নামে ধ্বংসলীলা।

হারাবেন রুজি রোজগার আপন সংস্কৃতি

প্রকৃতির গবেষণাগারে

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি কিভাবে প্রতিটা ভেড়িতে একটা করে নোংরা জল ঢোকানোর আর জমা জল বের করার জন্য পাইপ আছে। এগুলোর মুখের ঢাকনা খুলে দিলেই প্রয়োজন মতো জল ঢোকানো বা বার করা যায়। দেখলাম কীভাবে জমির ঢাল ব্যবহার করে নোংরা জল বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালগুলো দিয়ে। যেমন কয়েক জায়গায় দেখা গেল ভেড়ির জলের থেকে খালের জল বেশ নীচুতে। এখানে এই তফাৎটা ব্যবহার করে ভেড়ি থেকে জল বার করে দেওয়া হচ্ছে সহজেই। আবার যেখানে খালের জল উঁচুতে থাকছে সেখানে নোংরা জল ভেড়িতে ঢোকানো সহজ হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার একটা ভেড়ির বার করে দেওয়া জল খালে না ফেলে পাশের কোনো ভেড়িতে ঢোকানো হচ্ছে। এটা বিশেষ করে সেইসব ভেড়িতেই করতে হচ্ছে যে ভেড়ির জল বেরোনোর খালগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সল্টলেক মহানগরী তৈরির সময়ে। আবার কখনও দেখলাম পাশাপাশি দুটো খাল যাচ্ছে—একটাতে কুচকুচে কালো নোংরা জল, অন্যটাতে ভেড়ি থেকে ছাড়া একটু পরিষ্কার সবজে রঙের জল। এক কথায় জলের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ভেড়িগুলোর আশপাশে একটা খালের জাল তৈরি করেছেন এখানকার মানুষ।

"ভেড়ির জলের রং, গন্ধ আর স্বাদ দেখে আমরা বুঝতে পারি ভেড়ি থেকে জল কতটা বার করে দিতে হবে আর কতটাই বা নোংরা জল ঢোকাতে হবে।"—বললেন এক ভেড়ি শ্রমিক।

আমরা দেখলাম কীভাবে ছোট ছোট পুকুরে ডিম-পোনা ছাড়া হয়। একটু বড় হলেই সেগুলোকে তুলে নিয়ে অন্য একটা ছোট পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর তিন চার ইঞ্চি লম্বা হলে তাদের চালান করা হয় বড় ভেড়িগুলোতে। শেষে 100-150 গ্রাম ওজনের হলেই মাছ বাজার ঘুরে ভাতের পাতে। এর ফাঁকে পুকুরের কালো জল পরিণত হয় টলটলে পরিষ্কার জলে।

প্রতিদিন ধাপা অঞ্চল থেকে প্রায় 150 টন সব্‌জি কলকাতার বাজারে আসে। আর আসে 22 থেকে 25 টন মাছ। এর মধ্যে আছে চারাপোনা, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে সস্তা মাছ। যা কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির প্রোটিনের চাহিদা মেটায়। এছাড়া অল্পস্বল্প চিংড়ি, পারশে, ভেট্‌কি, ভাঙ্গর জাতীয় মাছও আসে।

দেখলাম কচুরিপানা

বড় ভেড়িগুলোর চারপাশে বাঁধের ধারে ধারে দেখলাম কচুরিপানা হয়ে রয়েছে জলের মধ্যে। এগুলো পরিষ্কার করা হয়নি কেন প্রশ্ন করতে একজন ভেড়িশ্রমিক উত্তর দিলেন—"অনেক উপকারে আসে এই কচুরিপানা। জলের ঢেউ থেকে বাঁধকে বাঁচাতে সাহায্য করে এই কচুরী পানা। আবার গরমকালে ছোট মাছগুলো পানার তলায় ছায়ায় এসে ঠাণ্ডা হয়। তাছাড়া কিছু মাছ—যেমন তেলাপিয়া, নাইলোটিকা—ডিম ছাড়ে এই কচুরী পানার মধ্যেই।" পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম নোংরা জলের সাথে মিশে থাকা কিছু কিছু ভারী ক্ষতিকর ধাতুকে কচুরী পানা নিজের দেহে টেনে নেয়—ফলে জলও পরিষ্কার হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, ভেড়িতে এসেই ওই নোংরা জলের ময়লা পরিষ্কার হয় আর জলের মধ্যে কমে-যাওয়া অক্সিজেন আবার বেড়ে ওঠে।

শহরের প্রায় 1500 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নর্দমা বাহিত নোংরা জলের আনুমানিক 30 ভাগ জল ব্যবহৃত হয় এই জলাভূমিতে। পরিশোধিত হয়ে ফিরে যায় খালে। এই এলাকা বুজিয়ে দিলে এই ময়লাও বইতে হবে সেই খালকে। বাড়তি চাপ সইতে পারবে তো এই খাল?

আদিতে ধাপার মাঠ

কলকাতা শহরের ছেলেবেলায়, নোংরা আবর্জনা ফেলা হোতো নোজা হুগলী নদীতে। তারপর বেশ কয়েক বছর ভরাট করা হোতো মজে যাওয়া খাল, নীচু জমি ওই নোংরা দিয়েই। এভাবেই মারাঠা খাল বুজিয়ে সার্কুলার রোড তৈরী হয়েছে। তারপর বছর ঘুরেছে—কলকাতা বড় হয়েছে। বেড়েছে আবর্জনার স্তূপ। খোঁজ পড়েছে পাকাপোক্ত নোংরা ফেলার জায়গার।

1865 সালে পূর্ব কলকাতা জলা-ভূমির ধারে ধাপা অঞ্চলের 1 বর্গ মাইল অঞ্চলকে, বেছে নেওয়া হয়েছে এ জন্য। বিদ্যাধরীর নোনা জল থেকে বাঁচাতে, চারধারে উঠেছে বাঁধ। চালু হয়েছে ধাপা রেল—সার্কুলার রোডের রাজাবাজার থেকে ধাপার মাঠ। ধাপায় রেল লাইনের দুপাশে আবর্জনা ঢালা হয়েছে। জমি হতে থেকেছে উঁচু। তখন রেল লাইন তুলে নিয়ে ওই উঁচু জমির পরে, আবার পাতা হয়েছে লাইন। এভাবে ময়লা আবর্জনার উঁচু জমির মাঝে মাঝে থেকে গেছে নীচু খালের মতন অংশ—আগেকার রেল লাইনের জায়গা।

সুন্দর চাষের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। ময়লা ফেলার হলদে লরীগুলো স্তূপ করে ময়লা ফেলে চলে যায়। সেগুলোকে তারপর সমান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লাগানো হয় শাক সবজি। জলের অভাব নেই—কিছুদূর অন্তর একটা করে কলকাতার নোংরা জলের খাল বয়ে যাচ্ছে খেতের মধ্যে দিয়েই। আর ওই জমিই সোনা ফলাচ্ছে।

কলকাতা হারাবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন টাট্‌কা সব্‌জি তাজা মাছ

আর কলকাতা শহরের অর্থাৎ ময়লা আবর্জনার ওপরই চাষ হচ্ছে, শহরের নোংরা জল দিয়েই। ময়লাও মাটিতে পরিণত হচ্ছে, কলকাতা টাটকা সবজি পাচ্ছে। একই জিনিষ বারবার ব্যবহার হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে কম। ধরা যাক ফুলকপির কথা। রান্নার সময় ডাঁটাগুলো ফেলে দিচ্ছি; সেগুলো জঞ্জালের সঙ্গে মিশে লরিতে করে ধাপা গিয়ে পড়ছে; সেগুলোই পচে, সার হয়ে, নতুন তাজা ফুলকপি তৈরী করছে। ফলে রাসায়নিক সারের প্রয়োজনই হচ্ছে না। যে সার তৈরীতে লাগে কোটি কোটি টাকার কারখানা। পৃথিবীর বুক চিরে ওপড়াতে হয় লক্ষ লক্ষ টন খনিজ। বছর বছর সার লাগাতে অপচয় হয় অর্থ, প্রকৃতির রসদ। বাড়তি বোঝা হিসেবে জোটে জীবন নাশকারী পরিবেশ দূষণ।

এই প্রসঙ্গে একজন ভেড়ি শ্রমিকের মন্তব্য—"এখানকার মানুষজন প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বাঁচতে শিখেছি। আর এই ভেড়ি অঞ্চলে আমরা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে চলার হিসেবটাও শিখছি। ঝিলমিলের ধারে নলবন—তারপরের যে পাঁচটা ভেড়ি গায়ে গা লাগিয়ে আছে, সুকান্তনগর, ৪নং, সর্দার, চকের ভেড়ি আর নারকেলতলা—তার মধ্যে সর্দার ভেড়ি বাদে বাকি চারটেতেই এখন চলছে ভেড়ি শ্রমিক সমবায়। কেউই এখনও সরকারের স্বীকৃতি পায়নি ঠিকই—কিন্তু বেশ ভালই চলছে। 25 থেকে 35 টাকা রোজ পেয়েও সমবায়তে কিছু টাকা জমেছে মাত্র কয়েক মাসেই। এই ভেড়ির মালিকরা চাষ বন্ধ করে ফেলে রেখেছিলো—কোথাও লাভ নেই দেখিয়ে, কোথাও শরিকী মামলা দেখিয়ে। আসলে ওসব বাজে কথা, এসব প্রোমোটারদের কাছে বিক্রী করার তাল।"

মনে পড়ে গেলো কিছুদিন আগে এক বন্ধু অর্থনীতিবিদ্-এর কথা। তিনি বলছিলেন—এ অঞ্চল সম্পর্কে যতটুকু জানি তাতে এই জলাভূমিকে সোনার খনি বলা চলে। যদি উন্নয়নের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া হয়, এ অঞ্চলে যদি সমবায় ভিত্তিতে মাছ, হাঁস, সবজি চাষ চালানো যায়, তাহলে উঠে আসবে প্রচুর লাভ।

রাজনীতি কোন পথে·····

"যা হয়েছে, হয়েছে। এরপর আর এক ইঞ্চি জলাভূমিও নষ্ট হতে দেব না। আমরা খুব ভালো করেই বুঝি পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি কত দামী—এখানকার মানুষের স্বার্থে—কলকাতার মানুষের স্বার্থে।" এ বক্তব্য একজনের নয়—বেশ কয়েকজন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীর। 1989 সালে হাজার দশেক জলাভূমির মানুষের মিটিং-এ দাঁড়িয়ে তাঁরা সজোরে এ কথা বলে গেছেন। মিটিং-এর বিষয় ছিল 'পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ।'

অথচ সেই সরকারই আজ এই জলাভূমি বুজিয়ে বসত গড়ার আর ট্রেড সেন্টার গড়ার ঢালাও অনুমতি দিচ্ছেন। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন তাই—কিভাবে হচ্ছে এসব?

ব্যবসায়ী সাধন দত্তর সাধের প্রকল্প 'ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার।' আশা ছিল গঙ্গার ধারে গড়বেন। জমি পাননি। তাই নজর পড়েছে জলাতে। সাধনবাবু পরিবেশ সচেতন। তাই সবুজ আর জলঘেরা মনোরম পরিবেশে গড়তে চাইছেন ট্রেডিং কমপ্লেক্স, পাঁচতারা হোটেল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রমোদ উদ্যান—মানে মিনি আধুনিক শহর।

শোনা যাচ্ছে সরকার ঝিলমিল লাগোয়া 1500 একর অর্থাৎ 4500 বিঘে জলা বুজিয়ে তৈরী করবেন তিন লক্ষ মানুষের থাকার জন্য বাড়ি। তারই একটু পুব দিকে 137 একর জলাভূমির উপর তৈরী হবে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার। তাছাড়া জমির দালালরা তো আছেই। শয়ে শয়ে বিঘা জমি ইতিমধ্যেই বিক্রি করেছে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের কাছে। যে জমির মাইল খানেকের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই এখনও। স্থানীয় মানুষ, মন্ত্রী আমলার দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরছেন। সবাই বলছেন—'দেখছি'। তাই এদের প্রশ্ন—'আর কতদিন ধরে এরা দেখবেন?—এ কোন ধরণের রাজনীতি?'

হাত বদল আর রূপ বদল

মেছো ভেড়ি থেকে বসত বাড়ি হচ্ছে তিন ভাবে। কোনো কোনো জায়গায় ভেড়ি মালিকরা সোজা প্রোমোটারদের কাছে জলাভূমি বিক্রী করছে। জমির দলিল-এ জলাভূমি প্রথমে হচ্ছে ধানজমি. তারপর বাস্তু জমি। ওই অঞ্চলের 'পার্টি' হোলো পাহারাদার। দ্বিতীয় কায়দা একটু অন্যরকম। 'পার্টির' নেতৃত্বে ভেড়ি শ্রমিকদের দিয়ে ফ্ল্যাগ পুঁতে ভেড়ি দখল হচ্ছে—জল বার করে দিয়ে মাছ লুঠ হচ্ছে। তারপর 'শুকনো ভেড়ি' শ্রমিকদের ধান-জমি বলে বিলি করা হচ্ছে। শেষে সেই ধান-জমির জন্য শ্রমিক/কৃষকদের কিছু পাইয়ে, জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে প্রোমোটারদের হাতে।

প্রমোটার না আজকের মগ।—কথাটা খুব চালু জলা এলাকায়। ইতিহাসে দেখেছি আগে পুব দিক থেকে নৌকো করে জলা বেয়ে আসত মগেরা। দমদমার উঁচু ঢিবিতে নৌকো বাঁধত। তারপর শুরু হত লুটপাট আজকের মগেরা আসছে পশ্চিম থেকে পুবে।—জলাটাকেই লুঠ করতে।

আর তৃতীয় কায়দায় 'পার্টি'ও নেই প্রোমোটারও নেই নাটকের স্টেজে। চালু ভেড়িগুলো রাজ্যসরকারের মৎস্য দপ্তর 'উন্নয়ন ও জনস্বার্থে' হাতে তুলে নিচ্ছে। তারপর কয়েক বছর চালিয়ে সরকারী নগর উন্নয়ন দপ্তরকে দিয়ে দিচ্ছে। সরকারী আবাসন গড়ার জন্য।

আমরা হারাব পরিবেশের ভারসাম্যকারী একটি অতুলনীয় উৎপাদন ব্যবস্থা

জলাভূমির মানুষেরা কি বলছেন

এঁদের সাথে ঘোরাঘুরি করে কথাবার্তা বলে বুঝেছি—উচ্ছেদের আতঙ্ক নিয়ে আর দিন কাটাতে চাইছেন না এঁরা। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথা ভাবছেন। পথে বিস্তর বাধা জানেন। তবুও সংকল্প—জলাভূমি এঁরা বাঁচাবেনই। নিজেদের স্বার্থেই বাঁচাবেন। তাঁদের বিশ্বাস সরকার যদি কিছু নাও করেন তো নিজেদের শ্রমের ফসল দিয়েই স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব তাঁরা নিজেরাই নিতে পারেন। শুধু তাঁদের অনুরোধ বারে বারে তাঁদের ওপর এমন হামলাবাজী বন্ধ হোক। শহর কলকাতার

অন্যান্য চাষের এলাকায় একর প্রতি একজন শ্রমিকের সারা বছরের কর্মসংস্থান তথা অন্ন সংস্থান হয়না। এখানে তা সম্ভব হয়েছে। ময়লা জলে মাছ চাষের পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

মানুষদের উদ্দেশ্যে তাঁদের বক্তব্য কলকাতার পূর্ব প্রান্তে তাঁদের অবস্থান শহর কলকাতার পক্ষেও কম উপকারী নয়। ফলে তাঁদেরও সমর্থন তাঁরা পাবেন আশা রাখেন।

ময়লা থেকে পরিষ্কার জল

ভেড়ীতে ময়লা জল পরিশুদ্ধ হয় প্রাকৃতিক উপায়েই। ময়লা জলের ময়লা বলতে বোঝায় হরেক রকম জৈব অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য। এগুলি ময়লা জলে থাকা কোটি কোটি জীবানুর খাদ্য ও শক্তির উৎসও বটে। যথেষ্ট সময়, উপযুক্ত উষ্ণতা ও জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন পেলে এবং জলের অম্লতা ও ক্ষারত্ব বেশী না হলে এই দ্রব্যগুলি ভেঙ্গে জীবানুরা তাদের শক্তি জোগায়, খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে বংশবৃদ্ধি চলে অবাধে। এর ফলে তৈরী হয় মূলতঃ নিরীহ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল।

আবার জলের মধ্যকার শ্যাওলা কণারা (প্ল্যাঙ্কটন) এই কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল থেকে সূর্যরশ্মির সাহায্যে তৈরী করে তাদের খাদ্য। এই বিষক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। জলে যেহেতু অক্সিজেনের দ্রাব্যতা কম, অতিরিক্ত অক্সিজেন বাতাসে মিশে যায়। প্ল্যাঙ্কটনেরও বংশবৃদ্ধি করে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন সমস্ত জলজ প্রাণীর শ্বসন ক্রিয়ার জন্যও প্রয়োজন হয়। জলের মাছেরা প্ল্যাঙ্কটন খায়। ময়লা জলের অনেক জৈব বস্তুও মাছের খাদ্য। এইভাবে জলের পরিশোধন প্রক্রিয়া চলতে থাকে অবিরাম।

তবে জলে মিশ্রিত বেশ কিছু ভারী ধাতু, কিছু কিছু রাসায়নিক যেমন কীটনাশক ওষুধ, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি এভাবে বিনষ্ট হয় না।

কলকাতা অন্যত্র বাড়তে পারে

জলা নিয়ে টালবাহানা

1988 সালে কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের সাতটি দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিদদের নিয়ে। বিষয় ছিল—'পূর্ব কলকাতার জলাভূমি।' আয়োজন করেছিল বিশ্বব্যাঙ্ক, ESCAP (FAO), GTZ এবং ভারত সরকারের-এর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই ধরণের জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এবং এই জলাভূমিকে মডেল করে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে এই রকম জলাভূমি গড়ে তোলা।

এই জলাভূমির পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি হল—

1. এই জলাভূমি অঞ্চল থেকে আসে শহরের মানুষের জন্য টাট্‌কা সব্‌জি ও মাছ। পরিমাণে দৈনিক প্রায় দেড়শ টন সব্‌জি এবং বাইশ থেকে পঁচিশ টন মাছ।
2. কলকাতার নর্দমা বাহিত জলের একটা অংশ এই জলা এলাকায় প্রাকৃতিক উপায়ে পরিশোধিত হয়। এর বিকল্প হিসেবে প্রয়োজন হত বিপুল অর্থ ব্যয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতি।
3. এই জলাভূমির দ্বারা শহরের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার সমতা (temperature balance) রক্ষা হয়।
4. সর্বোপরি এই জলাভূমি পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার মানুষের জীবিকা ও বাসস্থানের ক্ষেত্র।

1979 সালে পঃ বঙ্গ রাজ্য সরকার Town and country planning Act ; 1979—নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন এবং 1986 সালে ওই আইন কার্যকর হয়। এই আইনে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে যে সেই সব জলাভূমি-পুকুর-ডোবা ইত্যাদি কোন মতেই বুজিয়ে ফেলা যাবে না যদি সেগুলো (ক) জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ; (খ) জল নিকাশী ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ; (গ) অগ্নি নির্বাপনের কাজে ব্যবহৃত ; (ঘ) পরিবেশ ও বাস্তুতান্ত্রিক (ecological cause) ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এবং (ঙ) মাছ চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি স্বাভাবিকভাবেই এই আইনের আওতায় পড়ছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অথচ 1988 সালের 31শে আগষ্টের টেলিগ্রাফ পত্রিকার একটি খবরে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সল্টলেকে উপনগরী সম্প্রসারণের জন্য 783·78 একর জলাভূমি অধিগ্রহণ করবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার দু'বছরের মধ্যেই নিজেদের তৈরী আইন লঙ্ঘন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এদিকে 1990 সালের আগস্ট মাসে রাজ্য সরকার আরও একটি সেমিনারের আয়োজন করে। তাতে যোগ দেন কলকাতার পাঁচজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন জিওলজীকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শ্রী সুব্রত সিংহ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েটল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের শ্রী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শ্রী আশিস ঘোষ, বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী শ্রী সুনীল মুন্‌সি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতি মনিদীপা চ্যাটার্জী। এঁদের প্রত্যেকেই 800 একর জলা জমি অধিগ্রহণ করে শহর সম্প্রসারণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন। এমনকি সি. এম. ডি. এ-র মুখ্য অধিকর্তাও এঁদের সাথে সহমত পোষণ করেন বলে জানান।

উল্টোদিকে 1991 সালের 30শে জুনের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেল যে সরকার জলা এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণ গড়বেন। এবং এই সময় থেকে ঘন ঘন আরও সব খবর বেরোতে লাগল খবরের কাগজে। যেমন,

* একদল সশস্ত্র লোক কোন কোন ভেড়ী বেনামী আখ্যা দিয়ে জোর করে দখল করে নিচ্ছে।
* সরকার এক হাজার বিঘে জলা জমির উপর তৈরী করবেন দ্বিতীয় চিড়িয়াখানা।
* 800 নয় 1500 একর জমির ওপর হবে নতুন আবাসন প্রকল্প।
* কলকাতার বড় বড় প্রমোটাররা বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ী যাতায়াত করছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত আপাতঃ বিরোধী খবর থেকে অনেকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে আসছে। যেমন,

* পাঁচ বছর আগে যে সরকার জলাভূমি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন, সেই সরকার কেন তার নিজের আইনই ভাঙতে উদ্যত ?
* উন্নয়নের নামে মানুষকে বাস্তুচ্যুত ও কর্মচ্যুত করার উদ্যোগে এই সরকার কেন মদত দেবেন ?
* বর্জ্য আবর্জনা পরিশোধনের এমন একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদ্যোগ কেন ভেঙে দেওয়া হবে ?
* প্রমোটারদের দৌরাত্ম্য দেখেও সরকার কেন চোখ বুজে আছেন ?
* এতজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ কেন সরকার অগ্রাহ্য করলেন ?

—সুদীপ্ত সেন

গৃহ সমস্যা সমাধানের নামে কলকাতা শহর ধ্বংস নয়

জলাভূমির মুখোমুখি

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ভরাট করে 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র' হবে, তৈরী হবে বড় বড় আবাসন—এমন সব খবর প্রায়ই প্রচারিত হচ্ছে খবরের কাগজে। এ কথাও প্রচারিত হচ্ছে যে এর ফলে কলকাতার ময়লা জল পরিশোধনের ব্যবস্থা বেশ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং এই উন্নয়ন প্রকল্পের ধাক্কায় আবার ভিটে-মাটি জীবিকা হারাবেন বেশ কয়েক হাজার মানুষ। এ নিয়ে আমাদের অনেকেরই মনে নানান প্রশ্ন জমা হচ্ছিল। সেজন্য বেশ কয়েকদিন আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম ওই ভেড়ী অঞ্চলটা দেখতে, লোকজনদের সাথে পরিচিত হতে এবং তাঁদের কথা শুনতে।

জায়গাটা কেমন

আদিগন্ত বিশাল জলাভূমি আর তাকে ঘিরে রয়েছে জালের মত সরু সরু খাল আর নালা। তারি মাঝে দ্বীপের মত জেগে আছে ছোট বড় অনেকগুলি গ্রাম। আর আছে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলা দূরত্বে উত্তর দিকে সল্টলেক উপনগরী। রাতের অন্ধকারে ভেড়ি এলাকা থেকে ঝলমলে আলোর মালায় সজ্জিত সল্টলেক শহর দেখতে ভালই লাগে। তবে এঁদের ঘরে জ্বলে কেরোসিন কুপি। বিদ্যুতের কথা ছেড়েই দিলাম—পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকুও নেই। গোটা এলাকায় কয়েকটি টিউবওয়েল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও বেশীর ভাগই অকেজো। 'স্যানিটেশন ব্যবস্থা' বলে কিছুই নেই। একটা প্রাথমিক স্কুল চোখে পড়লেও এই বিশাল অঞ্চলের কোথাও কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখিনি। ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখ এদের নিত্যসঙ্গী। আর সাপের কামড়ে মৃত্যু তো স্বাভাবিক ব্যাপার!

তবুও এখানে আছেন মানুষ। নিত্য দিনের সুখ দুঃখ দারিদ্র নিয়েই আছেন। তবে কথাবার্তা বলে একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে হল। সব চেয়ে লক্ষণীয় এঁদের নিজেদের ওপর আস্থা। কোনরকম বাইরের সহায়তা ছাড়াই দিব্যি কেমন ময়লা জলে সব্জী ও মাছ-চাষের ব্যবস্থা গড়ে তুলে দিনগুজরান করছেন। এজন্য এঁদের গর্বের অন্ত নেই। অথচ এমন স্বনির্ভর হাজার তিরিশেক মানুষের একটি জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করার অপচেষ্টা চলছে।

জলাভূমির রাত্রি-দিনের কাব্য

মাঝ রাতে জেগে ওঠে ভেড়ি এলাকা। কাজে বেরিয়ে পড়ে মেয়ে পুরুষ। রাত তিনটের মধ্যে ভেড়ির জলে নেমে হাতে হাতে জাল টানা চলে কোমর থেকে বুক জল অবধি ডুবে। ধরা পড়ল যে মাছেরা তাদের ভাগ্য আড়তদারের 'কাঁটা'য় ওঠা। তবে কেউ কেউ রেহাই পেয়ে যায় সে যাত্রা ছোট বলে। এক দফা ঝাড়াই বাছাই করে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছেদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় জলে, খেয়ে দেয়ে বড় হওয়ার জন্য। সাধারণতঃ খুব বেশী হলে একশ থেকে দেড়শ গ্রাম ওজন অবধি বাড়তে দেওয়া হয় এদের। বেশী বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করায় ঝামেলা অনেক। তাতে অনেকদিন আটকে থাকে টাকা। তার ওপর বড় মাছ ছোট মাছ খেয়ে ফেলে, আর চুরির ভয় তো আছেই। এজন্য অবশ্য পাহারাদারির ব্যবস্থা রয়েছে।

এরপর সূর্য উঠি উঠি করার আগেই দলে দলে লোক সেই মাছ এনে ফেলে 'কাঁটা'য়। 'কাঁটা'—মানে স্থানীয় আড়ৎ। এখানে ওজন হয়। দর দস্তুর কেনা-বেচা, হিসেব নিকেশ চলে। রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, পোনা থেকে তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, সিলভার কার্প, পার্শে, চিংড়ি হরেক মাছের হরেক দাম। সার সার ভ্যান সেই মাছ নিয়ে ছুটে চলে শহরের বাজারে। সেখানে মানুষ থলে হাতে দাঁড়িয়ে আছে টাট্‌কা মাছ কিনবে বলে।

সূর্য উঠল আর এঁদের কাজও শেষ হল। তবে এটা হল একটা পর্যায়। জাল টেনে মাছ তোলার আগে আছে বেশ কটি পর্ব। অপূর্ব দক্ষতায় এসব কাজ সমাধা করেন স্থানীয় মানুষ। ডিম পোনা থেকে চারা পোনা করার জন্য আছে ছোট ছোট 'নার্সারী পুকুর'। খেয়ে দেয়ে দৈর্ঘ্যে 2—3 ইঞ্চি হলে এদের তুলে পাশের বড় জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই জলাশয়গুলোয় যথেষ্ট পরিমাণে মাছের খাদ্য জোগানের জন্য রয়েছে ময়লা জলের ক্যানালের সাথে এর যোগাযোগ। বাঁশ ও কাঠের লক গেট দিয়ে দরকার মত নোংরা জল ঢুকিয়ে নেওয়া হয় ভেড়িতে। অভিজ্ঞ লোকেরা জলের রঙ দেখে বলে দেন জলের গুণাগুণ। কোন জলে কোন মাছ চাষ হবে।

মাসের মধ্যে কম বেশী পনের দিন জাল ফেলা হয়। বাকি পনের দিন অন্য কাজ। বছরে বার চারেক মাছের ডিম বা পোনা ছাড়া হয়। কতটা মাছ একেক বারে তোলা হবে তা ঠিক হয় প্রয়োজন ও বাজার বুঝে।

জলাভূমি রক্ষায় এগিয়ে আসুন

কয়েক বছর অন্তর ভেড়ির জল বার করে দেওয়া হয়। মাটি শুকোলে লাঙ্গল চালিয়ে মাটি আল্‌গা করে মহুয়ার খোল আর চুন দিয়ে ক'দিন ফেলে রাখা হয়। পরে আবার জল ভরে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত শ্যাওলা হলে এইভাবে পরিষ্কার করা হয় জলাশয়। জলের রঙ দেখে এঁরা ঠিক করেন কখন ভেড়ি পরিষ্কার করতে হবে। জলে মাছের খাদ্য খুব বেশী হলেও সমস্যা। ওঁদের কাছে জানতে পারলাম—অনেক ছোট মাছ নাকি বেশী খেয়ে পেট ফেটে মরে যায়!

এখন কেমন চলছে

এক সময় এখানকার সব ভেড়িই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বর্তমানে 4 নম্বর, সুকান্তনগর, নারকেলতলা ও চকের ভেড়ি—এই কয়েকটিতে মৎস্যজীবীরা সমবায় তৈরী করে চাষ করছেন। যদিও সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নম্বর মেলেনি এখনো। প্রায় প্রতিটি সমবায় ভেড়ির শ্রমিকের মাইনে মাসে 1010 থেকে 1050 টাকার মধ্যে। এছাড়াও প্রত্যেক শ্রমিক কিছু পরিমাণ মাছ, বিড়ি-দেশলাই, শীতে কম্বল ও বর্ষায় ছাতা পান বিনি পয়সায়। কোন কোন ভেড়িতে পূজোয় বোনাসও দেওয়া হয়।

দৈহিক পরিশ্রমের কাজ, যেমন জাল টানা, ভেড়ি কাটা, বাঁধ দেওয়া এসব যাঁরা করেন তাঁদের দিনে 3/4 ঘণ্টা খাটতে হয়। আর হাল্কা কাজ, যেমন পানা পরিষ্কার, পাহারাদি এসব হলে দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টার মত। যে শ্রমিক আজ জাল টানলেন, কাল তাঁকে দেওয়া হয় পাহারাদারির কাজ, এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ বণ্টন করা হয় যাতে কোন একজনের ওপর বেশী কাজের চাপ না পড়ে।

নারী শ্রমিকও আছেন অনেকে। তবে তাঁদের জাল টানার মত ভারী কাজ দেওয়া হয় না—যদিও মাইনেকড়ি পুরুষ শ্রমিকের সমানই। তবে বেশীর ভাগ নারী শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা কাজ পেয়েছেন তাঁদের মৃত স্বামী, বাবা বা ছেলের জায়গায়—সাধারণ ভেড়ি শ্রমিক যেভাবে কাজ পান, সেভাবে নয়। চার নম্বর ও সর্দার ভেড়িতে অবশ্য কিছু সরাসরি নিযুক্ত নারী শ্রমিকও আছেন।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভেড়িগুলির চিত্র একটু ভিন্ন। সেখানে শ্রমিকদের মাস মাইনে 700—750 টাকার মত, আর খাটুনি দিনে কমপক্ষে 8—9 ঘণ্টা।

খাসমহল

চকের ভেড়ি, সর্দার ভেড়ি আর চিন্তা সিং ভেড়ির মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা উঁচু জমি রয়েছে। তারই নাম 'খাসমহল'। এখানে আশপাশের অনেক ভেড়ি শ্রমিকের বসবাস। বেশীর ভাগই মুণ্ডা, রাজবংশী ও অন্যান্য দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। গ্রামের পথে হাঁটতে আশপাশে বাড়ী ঘর মানুষজন দেখলেই স্পষ্ট হয় নিদারুণ দারিদ্র্যের ছবি।

তাঁদের অনেকে এক সময়ে ছিলেন চিন্তা সিং ভেড়ির শ্রমিক। সরকার সেই ভেড়ি অধিগ্রহণ করে। তারপর বাঁধ কেটে জল বের করে দিয়ে একে খাস জমি হিসাবে চিহ্নিত করে। শ্রমিকেরা অনেকে দেড় থেকে আড়াই বিঘের মত জমি পান। এখন সেখানে বছরে দুবার ধান চাষ হচ্ছে। তাতে সারা বছরের খোরাকি চলে না। বাকি সময়টা জনমজুরের কাজ করে কোনক্রমে দিন গুজরান করেন। আশেপাশে ভেড়িগুলির লাভজনক মাছ চাষ দেখে আজ উৎসাহী দু'একজন ধান-জমিকে অগভীর পুকুরে পরিণত করে মাছ চাষের চেষ্টা করছেন।

আজকের সংকট

ভেড়ি অঞ্চলের মানুষজনের আজ সত্যিই দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে। সল্টলেক উপনগরী পত্তনের সময়ে একবার এঁরা জীবিকা ও বাসস্থান হারিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। আবার একই আশঙ্কার মুখোমুখি। জানিনা কি এঁদের ভবিষ্যৎ। খাসমহলের বাসিন্দা মাঝবয়েসী একজন ভেড়ি শ্রমিক স্বপ্না মুণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'কি করবেন এবার?'

উত্তরে জানালেন—'যখন উচ্ছেদ করতে আসবে তখন দেখা যাবে।' একটু থেমে যোগ করলেন—'মুণ্ডা কখনো লড়াই ছাড়া জমি ছাড়ে না!'

—মিতা, স্বাতী, সুরশ্রী

With Best Compliments from

LEKTRON ENTERPRISE

Manufacturer Of Accurate & Reliable
Electronic Process Control Instruments.
44/1, SOUTH ROAD
CALCUTTA-700 075

Phone : 72-5161

Gram : APOGEE
Telex : 021-7252 IT 406

সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও কিছু প্রশ্ন

প্রবল ঝাঁকানির পর যখন চেতনা ফিরে এল তখন ঘড়িতে দেখলাম রাত তিনটের মতো বেজেছে। 19 অক্টোবরের সেই রাতে আমার মতো যাঁরা গঙ্গোত্রীতে ছিলেন তাঁরা সবাই তখন ঘটনার অভিঘাতে একটু কেমন হয়ে গেছেন। মাথার উপর ছাদটা অটুট আছে দেখে যতটুকু নিশ্চিন্তি অনুভব করছিলেন তা চতুর্দিকের ব্যস্ত পায়ের আওয়াজে বিঘ্নিত হচ্ছিল। প্রবল ভূমিকম্পে গঙ্গোত্রীতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী নয়। একটি আশ্রম প্রায় পুরোটা ধ্বসে গেছে—ভাঙা দেওয়াল আর পাথরের আঘাতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। এরপর রেডিওতে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশের খবর শুনলাম। শিহরিত হবার মতো সব খবর—আর সঙ্গে ত্রাণ-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ। সমতল থেকে অত উঁচুতে গিয়ে এই বিপর্যয়ের আঁচ লেগেছে সামান্যই—কিন্তু স্থানীয় লোকেদের মধ্যে আতঙ্ক দেখে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি। ভূমিকম্পের আগে সবাইকে যেমন ধীর-স্থির এবং অতি সাধারণ কথা বলার ছলে পাহাড় থেকে পাথর পড়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিবরণ দিতে শুনেছি—তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখে একটু আশ্চর্যই লাগল। (পরে অবশ্য বুঝেছি তাদের অস্থিরতার কারণ ত্রাণ-ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ ভরসাহীনতা)।

গঙ্গোত্রীর থেকে আরও উঁচু—যেমন তপোবন, গোমুখ, ভূজবাসা থেকে যে সব যাত্রীরা স্থানীয় পথ-প্রদর্শকদের সহায়তায় নীচে নেমে এলেন তাঁদের মুখে রাস্তার বিপর্যস্ত অবস্থার কথা শুনলাম। শুনলাম গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশীর দিকে নীচে নামার রাস্তাও বাস চালানোর অনুপযুক্ত।

পরের দিন সকালে দেখলাম সামরিক বাহিনীর একটি সরবরাহকারী দল খাদ্যসামগ্রী এবং ওষুধ নিয়ে গোমুখের দিকে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম ত্রাণ বিতরণ করতে নয়—যাচ্ছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ওপরের অস্থায়ী ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে! বন্যা-খরা-মহামারী হলে ছোট বয়স থেকে সামরিক বাহিনীর, 'বীরত্বের সঙ্গে সেই সংকটের মোকাবিলা করা'র ঐতিহ্যের কথা শুনে তাদের কর্মদক্ষতার প্রতি যে একটা সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময় গড়ে উঠেছিল—সেই ধারণাটা ঝাঁকি দিল প্রবলভাবে।

কোন্ মহলের সিদ্ধান্তের ফলে জানি না, আমরা যারা গঙ্গোত্রী থেকে হাঁটতে প্রস্তুত ছিলাম, পুলিশ-মিলিটারী আমাদের 'সুরক্ষা'র কথা ভেবে নীচে যাওয়া থেকে বিরত করল। সেই দুপুরেই আবার কার সিদ্ধান্তে জানিনা আমাদের হঠাৎ নামিয়ে আনল হরশিলের মিলিটারী ক্যাম্পে। মিলিটারীর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলের ক্ষমতাও (!) লক্ষ্য করলাম।

প্রথমে শুনলাম আটকে পড়া মানুষগুলোকে হেলিকপ্টারে করে নীচে নামিয়ে দেবে—পরে শুনলাম কেবলমাত্র বৃদ্ধ-শিশু-মহিলাদের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু চোখে দেখলাম সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিয়মভাঙার এক চূড়ান্ত উদাহরণ। হেলিকপ্টারের পর হেলিকপ্টার আসছে—কেন আসছে, কাদের জন্য আসছে জানা নেই।

প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে হেলিকপ্টার এল বহু। প্রধানমন্ত্রী আকাশ পথে পর্যবেক্ষণ করে চলে গেলেন—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেলিকপ্টার বাহিনী ফিরে গেল। ভাবছিলাম হায় রে—এরা যদি দয়া করে ভূজবাসাতে বুকে পাথর পড়ে আহত বয়স্কা মহিলাটিকে অন্তত হাসপাতালে নিয়ে যেত!

তারপর প্রায় পঞ্চাশ কিমি রাস্তা ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে উত্তরকাশী পৌঁছলাম। সেখানেও চোখে পড়ল একই চিত্র। চরম বিশৃঙ্খলা।

এবারে এই গাড়োয়াল অঞ্চলের ভূমিকম্পে প্রধান শিকার উত্তরকাশী ও চামোলী জেলার গ্রামের জনগণ। ভূমিকম্পের দশ-পনের দিন পরেও ত্রাণ-সামগ্রী এই সব গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়নি—অথচ হেলিকপ্টারে করে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর পরিকাঠামো ঐ অঞ্চলে বিদ্যমান। ত্রাণ-ব্যবস্থার পুরো কর্মকাণ্ডে সরকারী প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গাড়ী ভর্তি খাবার আর কম্বল পাঠিয়েছে—কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় বিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছতে পারেনি। অথচ রাস্তা সারানোর সরকারী সংস্থারও দেখা নেই।

পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ। বহু আধা-শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। অবশ্য গ্রামে এগুলো কোনো 'সমস্যা'-ই নয়—পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার নামও তারা শোনেনি। বা বিদ্যুৎ তাদের গ্রামে পৌঁছে দেবার কথাও কেউ ভাবেনা।

ভূমিকম্পের পরেও ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা চলেছে—দূরদর্শনের মাধ্যমে তা সারা দেশে প্রচার করা হয়েছে। অথচ সেই প্রচার-মাধ্যম ব্যবহার করে দুর্গতদের খবর অথবা ত্রাণ-সামগ্রীর আবেদন বা সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কথা সরকার ভাবেনি!

উত্তরপ্রদেশেরই আরেক অংশে তখন অতি ভক্তিভরে তথাকথিত

'রামজন্মভূমি'-র শিলান্যাস হয়েছে—বেশ কয়েক হাজার ভাবালু (এবং অবশ্যই ধান্দাবাজ) স্বেচ্ছাসেবী করসেবায় মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। করসেবকদের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যদি ত্রাণ-ব্যবস্থার সহায়তায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত তবে হয়ত ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষজন একটু স্বস্তি পেতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উল্টোটাই দেখেছি। উত্তরকাশী শহরের হাসপাতালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 'স্বেচ্ছাসেবক'দের দাপট। তাঁরাই ত্রাণের জন্যে চাঁদা তুলবেন—তাঁরাই চিকিৎসার কাজে সহায়তা করবেন এবং অবশ্যই সরকারী জিপগাড়ী তাঁরাই চাপবেন। হরিদ্বার-দেরাদুন রাস্তায় যানবাহন থামিয়ে গাড়ীচালকদের কাছ থেকে অযৌক্তিক পরিমাণ টাকা তাঁরা দাবী করেছেন—রসিদ দেবার প্রয়োজন মনে করেননি। দেরাদুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফিসারস্ অ্যাসোসিয়েশনের পাঠানো ত্রাণ—এক লরী কম্বল এবং প্রচুর শুকনো খাবার উত্তরকাশী থেকে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—করসেবকদের 'সেবা'র জন্য।

পায়ের তলার মাটি কাঁপলে কি হয়!

টিহরীর পশ্চিমে অধুনা পাকিস্তানে সিন্ধু নদীর কন্দরে পৃথিবীর অন্যতম বড় বাঁধ তৈরী হয়েছিল তারবেলা অঞ্চলে। নাঙ্গা পর্বতের নীচের দিকে 1840 সালে এক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের 6 মাস পরে পাহাড়ের বিরাট এক অংশ সিন্ধু নদীর কন্দরে এসে একটি প্রাকৃতিক বাঁধ সৃষ্টি করে—সেই বাঁধ উচ্চতা ও ধারণ ক্ষমতার দিক থেকে টিহরীর সমান। 1841-এর জুন মাসে আর একবার প্রকৃতির রুদ্ররোষে ধরিত্রীর আরও খানিকটা অংশ সেই প্রাকৃতিক বাঁধের ওপর নিক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে সেই প্রাকৃতিক বাঁধ বিপর্যস্ত হয়—বিশাল এক জলস্তম্ভ পাড়ি দেয় নীচের দিকে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় পথে যা ছিল। আজকের পর্যটকরা কারাকোরাম অঞ্চলে গেলে অতীতের সেই বিধ্বংসী প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের চিহ্ন দেখতে যান।

ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত গাড়োয়ালের এই চিত্র এমন কিছু ব্যতিক্রম নয়—প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেশের যে কোনো প্রান্তে ঘটে গেলেই বেনিয়ম আর সরকারের তরফে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এই অতি পরিচিত চিত্র বারবার ঘুরে আসে—প্রত্যেক বছর মেদিনীপুর-উড়িষ্যা অথবা অন্ধ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড় বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করে। মোটামুটি ভাবে এখন ভবিষ্যতবাণী করাও সম্ভব কোন সময়, কি জাতীয় তীব্রতার ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা ঘটতে চলেছে। আমাদের দেশে এখনও সংকটকালীন জরুরী ব্যবস্থার ছক্ তৈরী নেই—বিপর্যয় ঘটার আগে কিভাবে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যাবে—কি ভাবে সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে, বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে জনগণের কর্তব্য কী সে সব কথা প্রচারেরও কোনো ব্যবস্থা নেই!

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ বার বার দেখেছে সরকারী সাহায্য ও ত্রাণ-ব্যবস্থার নমুনা। তাই সরকারী আশ্বাসে বিশ্বাস হারিয়েছে মানুষ। তার প্রতিক্রিয়া দেখছি অন্যত্র। যেখানেই সরকার উন্নয়নের নামে মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছে—রুখে দাঁড়াচ্ছে মানুষ। বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাসে আশ্বস্ত হচ্ছে না তারা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিতর্কিত প্রকল্পগুলির দিকে এক ঝলক চোখ বোলাতে পারি। নর্মদা প্রকল্পে যতখানি চাষযোগ্য জমি বাড়বে প্রায় তার সমতুল্য বনাঞ্চল জলের তলায় চলে যাচ্ছে। বিরাট সংখ্যক মানুষজন উচ্ছেদ হচ্ছেন। যে তিনটি প্রদেশ জুড়ে এই প্রকল্প চালু হতে চলেছে, সেই তিনটি প্রদেশের উচ্ছেদ হওয়া মানুষজনদের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনর্বাসন প্রকল্প নেই। গুজরাট সরকার একজাতীয় পুনর্বাসন প্রকল্প দিচ্ছেন, মহারাষ্ট্র বা মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্প অন্যরকম। ভারত সরকারের এই জাতীয় পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য কোনো মডেল কর্মসূচীই নেই—তাই এক-এক প্রদেশ এক-এক ধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প দিচ্ছে। কর্তব্য নির্ধারিত হলেও সেই দায়িত্ব পালন করবে কে তার জন্য কোনো প্রশাসন নেই।

ভূপাল বিপর্যয়ের সাত বছর পরেও এই বিপর্যয়ের জন্য কে বা কারা প্রধানতঃ দায়ী তারও ফয়সালা হলো না। ভারতের সর্বোচ্চ আইন ব্যবস্থা, সুপ্রীম কোর্ট—কখনও ফৌজদারী মামলা থেকে ইউনিয়ন কার্বাইডকে অব্যাহতি দিচ্ছে—কখনও আবার সেই কোর্টই ফৌজদারী মামলা চালানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে যদি এই জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটে তবে পুনর্বাসন নিয়ে সরকারী প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে? সরকার আজও মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের অসুস্থতার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগই করে উঠতে পারলেন না। এর মধ্যে বিভিন্ন অসুস্থতার ফলে মৃত্যু ঘটেছে অনেকেরই।

এখন ভারতে যদি চের্ণোবিলের মতো বা তার থেকে ছোট মাপের বিপর্যয় ঘটে তার পরিণাম কি হবে ভাবাও বোধহয় অসম্ভব। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর ভারতের পরমাণু কমিশনের নারোরা নিউক্লিয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপারে বিবৃতি সব ধরনের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নিউক্লিয় শক্তি দপ্তর বলেছেন ভূমিকম্পে সব কিছু বিপর্যস্ত হলেও নারোরা নিউক্লিয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র অটুট থাকবে—বরং ভূমিকম্প শুরু হলে মানুষজন নিরাপত্তার জন্য নারোরার নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে পারে!

বাঁধের ফলে কি সত্যিই ভূমিকম্প হয়?

1967-তে মহারাষ্ট্রের কোইনা বাঁধ ধ্বসে যাবার পর বড় বাঁধের পক্ষের উন্নয়নপন্থীরা এটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরে ভারতেই আরও 40টা বাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে। 1972 সালে গুজরাট প্রদেশের মোরভি-তে মাচু বাঁধ ধ্বসে যায়। এ ছাড়া ছোট ছোট বাঁধের মধ্যে রয়েছে: 1958 সালে কাদাম, 1961 সালে পাঞ্চেৎ, 1972 সালে চিকাহোল, 1973 সালে ধান্তওয়ালা, 1974 সালে আরান ও হিংলো বাঁধ।

টিহরী বাঁধ প্রকল্প তৈরী হচ্ছে গাড়োয়াল অঞ্চলে। টিহরী বাঁধের উচ্চতা হওয়ার কথা 260 মিটার, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার মাত্র 15 মিটার তৈরী হয়েছে। রাশিয়ান এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মতে টিহরী বাঁধকে রিখটার মাত্রার 8·5 তীব্রতার ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এবারে ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার মাত্রায় মাত্র 6·2 একক কিন্তু তাতেই বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করার ক্ষমতা বর্তমান বিজ্ঞান এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি—তাই ভূমিকম্পের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা এখনও সম্ভব নয়। ভাবলে শিহরিত হতে হয় যদি টিহরী বাঁধ সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যেত এবং ভূমিকম্পের ফলে সেই বাঁধে ফাটল দেখা দিত! টিহরী থেকে হৃষীকেশ শহর এক ঘণ্টার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ধরা যাক সরকার কোনোভাবে সতর্কবার্তা প্রচারের সুযোগ পেল। সেক্ষেত্রে সরকারকে 35 মিনিটের মধ্যে দু'লক্ষ বা তারও বেশী লোককে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। তাও কি সম্ভব? এই অবস্থায় টিহরী গাড়োয়ালের লোকেরা যদি টিহরী বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয় তবে কি তা এক কথায় 'প্রগতিবিরোধী' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে?

টিহরী বাঁধ বিধ্বস্ত হলে কি হবে—
একটি কাল্পনিক প্রতিবেদন ঃ

ধরা যাক শত্রুপক্ষের বোমার আঘাতে অথবা ভূমিকম্পের কারণে টিহরী বাঁধ বিধ্বস্ত হল। তাহলে কি দেখব? —দেখব বিপর্যয়ের 40 মিনিটের মধ্যে 200 ফিট জলের তলায় চলে গেল হৃষিকেশ আর হরিদ্বার শহর, আর সেই সঙ্গে ডুবে গেল হৃষিকেশের আই ডি পি এল-এর মতো জীবনদায়ী ওষুধের কারখানা আর ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানাগুলো। তিনঘণ্টা পরে জলের ঢেউ পৌছল রুরকী শহরে— শহরের অধিবাসীদের পালানোর কোনো রাস্তাই রইল না। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে নেমে এল ঘন অন্ধকার—উত্তর ভারতের গ্রিড লাইন শর্টসার্কিট হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

পরের দিন সকালে ফতেগড়ের সেনাশিবির ধুয়ে নিয়ে জল ঢুকলো কানপুর শহরে। ইতিমধ্যে অধিবাসীদের এবং সেনাবাহিনীর সম্পত্তি বাঁচানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে—রাস্তা দিয়ে চলেছে ভীতচকিত মানুষের মিছিল। সদর রাস্তা, হাইওয়ে ইত্যাদি সব লোকে লোকারণ্য। কিছু সময়ের মধ্যেই কানপুর শহরের মৃত্যু ঘটল। ধ্বংস হয়ে গেল এইচ এ এল কারখানা আর ক্যান্টনমেন্ট।

তৃতীয় দিন এলাহাবাদ শহরের ভাগ্যে ঘটল একই পরিণতি। জল ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে পাটনা শহরে। গঙ্গার নীচের দিকে ততদিনে খাদ্য সঙ্কট শুরু হয়ে গেছে।

গঙ্গার অন্যান্য শাখা-নদী আর সেচের খালগুলোর জলও বেড়ে গেছে বিপুল পরিমাণে—তৃতীয় দিনের শেষে গড়মুক্তেশ্বর পেরিয়ে জল ঢুকল খোদ দিল্লী শহরে—কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমানবন্দর সহ বৃহত্তর দিল্লীর কোনো অস্তিত্বই রইল না।

নারোরা পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বেজে উঠলো এলার্ম — কর্তব্যরত কর্মীটি জানতে পারলেন বন্যায় তাঁর পরিবারের লোকদের ভেসে যাবার সম্ভাবনার কথা। নারোরার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র একটি মাত্র বোতাম টিপে তো আর থামানো যাবে না—তাই কর্মীটি কেন্দ্র থামানোর চক্রটি চালু করলেন। কিন্তু জলোচ্ছ্বাস এসে পুরো কেন্দ্রকে ঢেকে দিল—শর্টসার্কিট হয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিস্ফোরিত হলো। 100 কি মি ব্যাসার্ধের মধ্যে যেসব জনবসতি পড়ল, যেমন দিল্লী, আগ্রা, মথুরা ইত্যাদি—ভয়ানক ভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ল। গঙ্গার জলও এই দূষণের হাত থেকে রেহাই পেল না। জলস্রোত নামতে শুরু করল মোহনার দিকে—খাদ্যশৃঙ্খলে ততক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তেজস্ক্রিয়তা— ক্রমে তা এসে পৌছল আমাদের কলকাতা-তেও। সময় হয়ত লাগল সব মিলিয়ে সপ্তাহ খানেক।

গল্প কথা নয়—এবারের ভূমিকম্পেই গঙ্গার ওপর, উত্তরকাশীর কাছে মানেরী বাঁধ অল্পের জন্য ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে। যদি টিহরী বাঁধ তৈরী হয়ে যেত আর তা ভেঙে পড়ত……

[প্রতিবেদনটি যোগী রণজিত রচিত 'দ্য হিন্দুস্থান টাইম্‌স' 18. 3. 90-এর একটি প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত।]

—শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4নং অনুযায়ী ফরম বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশনার ভাষা—বাংলা ও ইংরেজী

প্রকাশনার স্থান—52/9C বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা 700012

প্রকাশকের কাল—দ্বিমাসিক

প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—রবীন মজুমদার, ভারতীয়, কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা 700009.

মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা—ঐ

সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—ঐ

প্রেসের নাম ও ঠিকানা—ইটারনিটি প্রিন্টার্স, 8, আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলিকাতা 700010

আমি, শ্রীরবীন মজুমদার, ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিবরণ মতে সত্য। স্বাঃ রবীন মজুমদার

প্রকাশক : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা

ভূপাল মামলায়

সুপ্রীম কোর্টের নিজের রায়ের ওপর রায়

ভূপাল গ্যাস বিপর্যয় মামলা ভূপাল জেলা কোর্টে শুরু হয়েছিল। সেই মামলা নিজের ঘরে তুলে নিয়ে আসে সুপ্রীম কোর্ট। দীর্ঘ শুনানীর পর রায় বেরোয় গত '89 সালের আঠারই ফেব্রুয়ারী। সেই রায়ের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সমালোচনা এবং প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। আসলে সেটা ছিল ভারত সরকার এবং ইউনিয়ন কার্বাইডের মধ্যে গোপন সমঝোতার এক বৈধ রূপ!

এরপর কেন্দ্রীয় সরকারে নির্বাচিত হয়ে আসে জনতা দল। তারা এই মামলাটি পুনর্বিবেচনার দাবী মেনে নেয় এবং মামলার শুনানী শুরু হয়। সেই সরকারও বিদায় নিয়েছে। কেন্দ্রে নতুন কংগ্রেসী সরকার অধিষ্ঠিত। গত তেসরা অক্টোবর '91 তারিখে এই মামলার রায় বেরিয়েছে। নতুন কিছু বলা হয়নি। দু'একটি মন্তব্য ছাড়া পুরণো রায়টিকেই বহাল রাখা হয়েছে। রায়ের মূল অংশগুলি এই রকম :

* সংবিধানের 142 (1) ধারা অনুযায়ী ভূপাল জেলা কোর্টের মামলা সেখান থেকে প্রত্যাহার বা অন্য আদালতে সরিয়ে নেওয়ার এক্তিয়ার ও ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে।

তবে কোন মামলা এভাবে বাতিল করাটা ন্যায়সঙ্গত কিনা আদালতকে তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে। বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন অভিযোগকে বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত নয়। কাজেই ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী বা ভারতীয় ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী ফৌজদারী মামলার হাত থেকে যে রেহাই পেয়েছিল তা বাতিল করা হল।

* ভূপাল আইনের 4 নম্বর ধারায় যদিও বলা হয়েছে ভারত সরকার গ্যাসপীড়িতদের মতামতকে গুরুত্ব দেবে, তার মানে এই নয় যে ক্ষতি পূরণের পরিমাণ ঠিক হয়েছে কিনা এ নিয়ে নতুন করে 'ন্যায্যতা সংক্রান্ত শুনানী' (ফেয়ারনেস ট্রায়াল)-র প্রয়োজন আছে।

* ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যদি কম হয়েছে বলে মনে হয় তো ভারত সরকারকেই সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

* মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'দাবী-দাওয়া আধিকারিক' গ্যাস আক্রান্তদের যে যে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন সেটাই গৃহীত হয়েছে। সাময়িক আক্রান্ত হিসেবে দেখিয়েছেন 1,73,382 জনকে। স্থায়ীভাবে আক্রান্ত 18,922 জন। সাময়িক আঘাতজনিত কারণে অক্ষম 7,122 জন। স্থায়ী আঘাতজনিত কারণে অক্ষম 1,313 জন। স্থায়ীভাবে অংশত অক্ষম 2,680 জন। এবং স্থায়ীভাবে পুরোপুরি অক্ষম 40 জন। 3,61,966 জন নথিভুক্ত গ্যাসপীড়িত মানুষের মেডিকেল রিপোর্ট থেকে বাছাই করে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী মোট মৃতের সংখ্যা 3,828।

* এখনও পর্যন্ত দাবী নথিভুক্ত হয়নি এমন গ্যাসপীড়িত মানুষ বা অজাত শিশুদের জন্য মেডিকেল গ্রুপ ইন্সিওরেন্স-এর বন্দোবস্ত করতে হবে। যার মাধ্যমে আগামী আট বছরের মধ্যে যে কেউ যথাবিহিত প্রমাণ সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ পেতে পারবে।

* গ্যাসপীড়িতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও নিয়মিত চেক আপের জন্য ইউনিয়ন কার্বাইডকে বলা হয়েছে সামনের 18 মাসের মধ্যে 500 শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণ করতে।

* দাবীদাওয়া দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ভূপাল আইনের প্রস্তাব অনুযায়ী সামনের 4 মাসের মধ্যে অন্তত 40 জন ক্লেমস্ কমিশনার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে।

রায়ের ওপর মতামত

আগের বারের মতই এবারেও এই রায় সম্পর্কে নানান প্রশ্ন উঠেছে। অনেক সমালোচনা হচ্ছে। সেগুলি মোটামুটি এই রকম :

* শতাব্দীর সবচেয়ে বড় শিল্প দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এই রায়।

* আট বছর ধরে গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত নজরদারীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হলেও ইউনিয়ন কার্বাইডকে আইনী জবাবদিহির আওতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

* ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথেষ্ট নয় বলে মনে করলেও ঘাটতি মেটানোর দায় ইউনিয়ন কার্বাইডের বদলে ভারত সরকার তথা ভারতীয় করদাতাদের ওপর চাপানো হয়েছে।

* আনুমানিক 50 কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল গড়ার ব্যাপারটা ইউনিয়ন কার্বাইডের সদিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের মাধ্যমে শ্রীরাম ফার্টিলাইজার-এর মামলা প্রসঙ্গে দেওয়া রায়কে (সংশ্লিষ্ট সংস্থার আকারের ওপর নির্ভর করে ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের নজিরকে) নস্যাৎ করা হল।

* এর মাধ্যমে দেশের সমস্ত বিচার ব্যবস্থার উপর সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপ বৈধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

* গ্যাসপীড়িতদের সংখ্যা এবং শ্রেণী বিভাগ নির্ণয়ের ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশ সরকারের দেওয়া হিসেবকেই বিনা পর্যালোচনায় মেনে নেওয়া হয়েছে, যদিও এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে।

* গ্যাসপীড়িতদের বক্তব্য শোনানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

নিজেদের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নিজেরাই গড়তে গ্যাসপীড়িতদের উদ্যোগ

ভূপালের গ্যাস-পীড়িত মানুষেরা এতদিন অপেক্ষার পর চিকিৎসার জন্য নিজেরাই একটি উদ্যোগ নিতে চলেছে। চিকিৎসার সাথে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্যাদি নথিভুক্ত রাখাও এদের উদ্দেশ্য। এই মর্মে একটি আবেদন পত্র আমাদের দপ্তরে এসেছে। সেটিই এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হল।

—সঃ মঃ

ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিকের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা আজ সরকারের দ্বারা অবহেলিত, বিচার বিভাগের কাছে প্রতারিত, 'মিডিয়া'-র দ্বারা বিস্মৃত। আই সি এম আর-এর হিসেব মতন এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 4,000 জন। বেসরকারী হিসেবে সংখ্যাটি প্রায় 12,000। দুর্ঘটনার সাত বছর পরে এখনও মারা যাচ্ছে মানুষ। আই সি এম আর তথা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ-এর দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে প্রায় পাঁচ লাখ লোকের দেহের নানান অংশ স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তা ক্রমশঃ অবনতির পথে যাচ্ছে।

সরকার যদিও দুটি হাসপাতাল বানিয়েছে গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসার জন্য, কিন্তু সাত বছর পরেও কোন সুষ্ঠু চিকিৎসা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। যা হচ্ছে তা হল রোগ-লক্ষণ চাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। আর ওষুধ হিসেবে অসুস্থরা যা পাচ্ছেন তার মধ্যে 37 শতাংশই অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর ওষুধ। প্রাইভেট চিকিৎসকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

সুপ্রীম কোর্টের 3 অক্টোবর 1991-এর রায়ে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগামী আট বছর ধরে গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্য সমীক্ষা (হেল্‌থ মনিটর) করতে। কিন্তু এখানেও সরকারী ব্যবস্থায় রয়েছে বিরাট ফাঁক ও ফাঁকি।

এই পরিস্থিতিতে ভূপাল গ্রুপ অফ ইনফর্মেশন এণ্ড এ্যাকশন (বিজি আইএ) গ্যাস আক্রান্তদের সেবার জন্য 1992-এর জানুয়ারীতে একটি কো-অপারেটিভ গঠন করতে চলেছেন। এতে থাকবেন স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তার, প্যারা মেডিক্যাল কর্মী এবং গ্যাসপীড়িতদের মধ্য থেকেই স্বাস্থ্যকর্মী হবার যোগ্য এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিরা। এখানে কাজ করার দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার হবে সকলের সমান। এই কো-অপারেটিভ এর কর্মীরা সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্য বিষয়টিকে এবং বিশেষ করে গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করছেন।

এই কো-অপারেটিভ-এর মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :

(1) কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ওষুধের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা।

(2) গ্যাস-আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যান্য রোগীদের রোগ নির্ণয় এবং প্রতিকারের ব্যবস্থায় ভাগ নেওয়ানো যাতে একটা পারস্পরিক সাহায্য-ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

(3) গ্যাসপীড়িত ব্যক্তিদের মাসে মাসে স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং নথিভুক্ত করা।

শুরুতে কো-অপারেটিভটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একটি ক্লিনিক চালাবে সপ্তাহে ছদিন, প্রত্যেকদিন ছঘণ্টা করে। এলাকার মানুষের সুবিধা অনুযায়ী ক্লিনিক খোলা থাকবে সূর্যাস্তের পরেও। গড়ে প্রত্যেক দিন 50 জন রোগী দেখা হবে। ওষুধপত্র দেওয়া হবে না-লাভ না-ক্ষতি ভিত্তিতে। এই ক্লিনিকে সহজ কিছু রোগনির্ণয়ের যন্ত্রাদি—বিশেষ করে ফুসফুসের ক্ষমতা এবং চোখ পরীক্ষার যন্ত্রাদি থাকবে।

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর সাত সাতটি বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও শহরে প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচজনের মৃত্যু হচ্ছে, যাঁরা সেই মারণ গ্যাসের কবলে পড়েছিলেন।

সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা 1. 12. 91

গোড়াতে একান্ত দরকারী কিছু আসবাব, ওষুধ এবং রোগনির্ণয়ের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন। মোবাইল ক্লিনিকের যন্ত্রপাতিও এখানে ব্যবহার করা হবে কিন্তু ভালভাবে ক্লিনিক চালাতে গেলে আরো যন্ত্রপাতির দরকার, এজন্য খরচ ধরা হয়েছে 60,000 টাকা। এছাড়াও প্রতিমাসে ক্লিনিকের ওষধপত্র (35 রকম প্রয়োজনীয় ওষুধ) ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা এবং অন্যান্য খরচ চালানোর জন্য মাসিক প্রায় 8,500 টাকার দরকার। এই টাকা তোলার জন্য আমরা সহানুভূতিশীল শক্তি এবং সংগঠনগুলির কাছে আবেদন করছি—ট্রেড ইউনিয়ন, জন-সংগঠন ও অন্যান্য সলিডারিটি গ্রুপের থেকে আমরা টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য চাই। কিন্তু কোন কর্পোরেশন, সরকার বা অর্থদানকারী বেসরকারী সংস্থার টাকা আমরা নেব না। অন্ততঃ দু বছর ধরে যেন আমরা বিনা বাধায় নিয়মিত ভাবে এই কাজ চালাতে পারি সেজন্য নিয়মিত অর্থসাহায্য / প্রতিশ্রুতি আমরা সাদরে আহ্বান করছি। টাকা মানি অর্ডার, অ্যাকাউণ্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে সতীনাথ সারেঙ্গির নামে নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সতীনাথ সারেঙ্গী
ই 11208 এরিরা কলোনী, ভূপাল-462016

প্রতিবেদন

উন্নয়ন পরিবেশ শিল্পায়ন

গত 5 অক্টোবর '91 মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি, সায়েন্স কম্যুনিকেটর্স ফোরাম, উৎস মানুষ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা—এই পাঁচটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'উন্নয়ন পরিবেশ ও শিল্পায়ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সহযোগিতায় ছিলেন বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম।

মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত বলেন, পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত 'উন্নয়ন' প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদেরই স্বার্থরক্ষা করে। এবং তা করতে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রেহাই দেয়না। এর বলি হয় দেশের দুর্বল শ্রেণীর মানুষ।

প্রবীন সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার বলেন, অনগ্রসর এলাকায় সার কারখানা বসালে যে সরকারী ভরতুকি মেলে, তার বখরা নেয় রাজনৈতিক দলগুলো। দেশে দেশে যখন রাসায়নিক সারের উপযোগিতা নিয়ে প্রবল বিতর্ক চলছে তখন আমাদের এখানে রাসায়নিক সার উৎপাদনের ঢালাও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত বলেন, চাষের জন্য অজৈব সারের ব্যবহার অপরিহার্য এমন মনে করার কারণ নেই। বেশ কিছুদিন আগে তার প্রমাণ দেখিয়েছে বাঁকুড়া জেলার রুক্ষ প্রান্তরে অবস্থিত গ্রাম গোবরা। যেখানে অজৈব সারের ব্যবহার না করেও সাবেকি পদ্ধতিতে চাষ করেই ঘটানো হয়েছে সবুজের সমারোহ।

জলপাইগুড়ি জেলার জয়েন্ট অ্যাকশান গ্রুপ অফ্ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে 'জাগো'-র প্রতিনিধি পুলক গাঙ্গুলী উত্তরবঙ্গের প্রস্তাবিত সুন্দরবন ফার্টিলাইজার লিমিটেড কারখানা থেকে সম্ভাব্য দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা, বিস্তৃতি ও বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে বিশদ প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন এই কারখানা উত্তরবঙ্গে শিল্প বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এলাকা ভাবগ্রাম ও রানীনগর ছেড়ে রাজগঞ্জের দরিদ্র গ্রামবাসীর ঘরের আঙিনাতে বসানো হল কেন? সরকারের প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় বিভিন্ন উদ্যোগের সাইনবোর্ডগুলো ঝুলছে বহুদিন। সেগুলোর নামগন্ধ নেই। অথচ স্থানীয় মানুষকে জানতে না দিয়ে চুপিসারে গড়ে উঠেছে এই কারখানা।

মোহিত রায় বলেন, জাতির অগ্রগতির সূচক হচ্ছে স্টীল ও সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের পরিমাণ। উন্নয়নের প্রশ্নে কিছু দূষণ মেনে নিতেই হয়। তবে দূষণ প্রতিরোধের পদ্ধতিও আছে।

প্রবীন সমাজ বিজ্ঞানী অজিত নারায়ণ বসু বলেন, কী ধরণের শিল্প আজকের দিনে প্রয়োজন, রাসায়নিক সার নেব কিনা—বিকল্প শিল্প কী, এসব প্রশ্ন সঠিকভাবেই আজ গুরুত্ব পাচ্ছে। তাঁর মতে এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে পঞ্চায়েতের অগ্রাধিকার থাকা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষে বলেন তপন সাহা। তিনি বলেন, পরিবেশ নিয়ে আমরা কিছু নাড়াচাড়া করেছি। আমরা মার্কসীয় দর্শন থেকে জেনেছি প্রকৃতির সাথে সমাজের সংঘাতের মধ্য দিয়ে আসে উন্নয়ন। উত্তরবঙ্গের ওই সার কারখানা যদি পরিবেশ দূষণের কারণ হয় তো আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। কারখানার উৎপাদন শুরু হোক। আমরা বিশুদ্ধ আন্দোলনে বিশ্বাসী নই।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সৌমেন গুহ বলেন, সালফার-ডাই-অক্সাইড, তা যত সামান্যই হোক ফুসফুসের ক্ষতি করবেই। আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে এই বিষাক্ত রাসায়নিকটির নিয়ন্ত্রণের কোন পথ আবিষ্কৃত হয়নি তিনি দেখান পরিসংখ্যানের কারচুপি দিয়ে কিভাবে সবুজ বিপ্লবের সাফল্য তথা রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে প্রচার চালানো হয়।

শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, শুনেছি সালফার-ডাই-অক্সাইড ক্ষতি করে মানুষের। কিন্তু এটাও সত্যি যে স্টীল ও সালফিউরিক এসিড না হলে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াই থেমে যাবে।

দর্শক শ্রোতাদের মধ্য থেকে তিনজন মতামত ব্যক্ত করেন। মনীন্দ্র নারায়ন মজুমদার বলেন পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত শক্তির হাতে বিজ্ঞান তার প্রগতিশীল ভূমিকা হারিয়েছে। তিনি বলেন—সবুজ বিপ্লব দেশের খাদ্যাভাব দূর করেছে এ ধারণা পাল্টানো দরকার। বিকল্প কৃষি পদ্ধতি আমাদের দেশেই আছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি রিচারিয়া এবং মাসানুবু ফুকুওকার কাজ উল্লেখ করেন।

অজয় দে বলেন, জৈব সার যথেষ্ট নয়। আরও লাভ চাই। তাই রাসায়নিক সারের কথা ভাবতেই হবে। উত্তরবঙ্গের প্রস্তাবিত কারখানা যদি সব দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে আপত্তির কি?

রবীন মজুমদার বলেন, সুন্দরবন ফার্টিলাইজার যদি সব দূষণ নিয়ন্ত্রণ করেই কারখানা চালাবেন তো সূচনাতেই নানান কারচুপি চালাচ্ছেন কেন? কারখানা বসানোর আগে কেন সাইট অ্যাপ্রেইজাল কমিটি-র রিপোর্ট নেওয়া হয়নি? কারখানা থেকে যদি আদৌ দূষণের ভয় না থাকে তো তাহলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাসস্থান কেন নির্মিত হচ্ছে কারখানা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরত্বে?

—বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

"……ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও ; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৩৯৮৩/৯১

সুন্দরবন ফার্টিলাইজার

আমাদের প্রতিবাদ

18. 12. 91 রাতে উত্তরবঙ্গের 'সুন্দরবন ফার্টিলাইজারে'র কারখানা চত্বর থেকে গ্রামবাসীদের ওপর গুলিচালনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংগঠন এবং পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তি গত 27 ডিসেম্বর সুন্দরবন ফার্টিলাইজার লিমিটেডের কলকাতা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ওই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবাদপত্র দেন। এই প্রতিবাদপত্রে পরিবেশ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কারখানা স্থাপন, স্থানীয় মানুষদের সাথে কারখানা ও সম্ভাব্য দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা না-করা এবং অবশেষে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আন্দোলনকারী গ্রামবাসীদের ওপর গুলি চালনার ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে।

কারখানা চালু হওয়ার প্রশ্নটি এখন কলকাতা হাইকোর্টের বিবেচনাধীন। কোর্টের সুবিবেচনার জন্য অপেক্ষা না করে কর্তৃপক্ষের কারখানার উৎপাদন শুরু করার প্রয়াসকে বিশেষভাবে নিন্দা করে দাবী করা হয়েছে যে—

* অবিলম্বে আপনারা উপরোক্ত সমস্ত কার্যাবলী বন্ধ করবেন এবং এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন।
* আপনাদের গুলি চালনা এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কাজের জন্য যা যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।
* জলপাইগুড়ি জেলাতে আপনাদের কারখানার দরুণ সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সমাধানের জন্য আপনাদের অবশ্যই সব রকমের গণতান্ত্রিক, আইনী, বৈজ্ঞানিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।
* অবিলম্বে আপনাদের উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

স্বাক্ষরকারী সংগঠন ও ব্যক্তি

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা
মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি
নাগরিক মঞ্চ
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র
ডিরোজিও বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরপাড়া বিজ্ঞান ক্লাব
নো মোর ভূপাল কমিটি
লতিকা গুহ
কলকাতা সায়েন্স এণ্ড কালচারাল ফোরাম

পরিবেশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার পানিকৌড়িতে বসছে সুপার ফসফেট সারের কারখানা—সুন্দরবন ফার্টিলাইজার লিমিটেড, যার চারদিকে ধান আর আনারস ক্ষেত। ফসফেট সার মানেই সালফিউরিক এসিড কারখানা। এমন কারখানা সব দেশেই পরিবেশ এবং মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর শিল্প হিসেবে চিহ্নিত। স্থানীয় পরিবেশ-সচেতন মানুষ তাই এর প্রতিবাদ করছেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে অটল। কারখানা তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। তাদের পাশে রয়েছে রাজ্য সরকার, প্রশাসন এবং পুলিশ। আন্দোলনকারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন নানাভাবে। অবশেষে গত 18 ডিসেম্বরের ঘটনা। কারখানা চত্বর থেকে ছুটে আসা গুলিতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী। পরের দিন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব একটি বিবৃতি দেন। কাগজে কাগজে তা প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতি "অসম্পূর্ণ এবং অসত্য"—এমন অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় মানুষদের পক্ষে রাজগঞ্জ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক।

নিম্নলিখিত ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে সত্য ঘটনাকে জনগণের কাছে প্রচারের জন্য রাজগঞ্জবাসীর আবেদন

গত 18.12.91 তারিখে সুন্দরবন সার কারখানার সামনে পুলিশের গুলি চালনায় 4 জন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। এ সংবাদ এবং ঘটনা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব মনীশ গুপ্তের বিবৃতি কাগজে 20.12.91 তারিখে ছাপা হয়েছে। আমরা মনে করি এ বক্তব্য অসম্পূর্ণ এবং অসত্য।

আপনাদের সরেজমিনে তদন্তের সুবিধার্থে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নীচে একটি বিবৃতি দিলাম।

গত 18.12.91 তারিখে আনুমানিক রাত্রি সাড়ে আটটা কি ন'টা নাগাদ সুন্দরবন সার কারখানার প্রোজেক্ট সাইট-ইন-চার্জ এস এস মায়োরা একটি মারুতি জিপসীতে কয়েকজন ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে রাজগঞ্জ থানায় আসেন। ফিরবার পথে রাজগঞ্জ বাজারেই ভি ডি ও হলের পাশে যেখানে শ্রী কৈলাশ চৌধুরী, শ্রী বাপী দাস, শ্রী উত্তম আগরওয়ালা, শ্রী লক্ষণ আগরওয়ালা, শ্রী সুনীল বর্মন-সহ আরো অনেকে ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন, সেখানে হঠাৎ উক্ত জিপসী গাড়ী থেকে নেমে ভাড়াটে গুণ্ডারা কৈলাশ চৌধুরীর উপর লোহার রড নিয়ে আক্রমণ করে। কৈলাশ ও তার খেলার সাথীদের 'বাঁচাও, বাঁচাও' চিৎকারে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে থাকা জিপসী গাড়ীকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু রণকৌশলী ভাড়াটে গুণ্ডারা উপস্থিত লোকজনকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে গাড়ী নিয়ে কারখানার দিকে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে গুণ্ডাদের গাড়ীর পিছনে ধাওয়া করেন।

এই ফাঁকে কিছু লোক ছুটে গিয়ে আমাদের কমিটির নেতাদের বাড়ীতে বাড়ীতে খবর দেন। আমরা সকলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উপস্থিত জনতার কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জেনে নিয়ে সহ সভাপতি শ্রী অজিত রায় ও শ্রী ভগবান দাস চৌধুরীকে নিয়ে আমি থানায় যাই এবং থানার ও সি-কে ঘটনা জানালে তিনি লিখিত ডায়েরী করতে বলেন। আমরা যখন থানায় ডায়েরী লিখছি তখন থানায় কিছু লোকজন এসে খবর দেন কারখানার দিকে অনেকক্ষণ যাবৎ গুলির ও বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে ও আগুন দেখা যাচ্ছে। এ খবর ও সি-কে জানাতে জানাতেই আবার কিছু লোক চিৎকার করে বলেন দুইজন গ্রামবাসীকে কারখানার গুণ্ডারা গুলি করেছে। এ সংবাদের পরে সঙ্গে সঙ্গে রাজগঞ্জ ও সি কারখানার দিকে ছুটে যান। আমরা লিখিত ডায়েরী রাজগঞ্জ পি এস কেস নং 130/91 তারিখ 18.12.91 ইউ/এস 341/323 আই পি সি জমা দিয়ে থানা ত্যাগ করি।

আমরা গুলিবিদ্ধ লোকদের ও আহতদের জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। কিছু পরে রাজু থাপা নামে এক যুবককে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রামবাসীরা নিয়ে আসেন। তাকে স্থানীয় কালীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে ডাঃ মণ্ডল তার পায়ের অপারেশন করে ছররা গুলি বের করে আমাদের দেখান।

যাঁরা আহতদের নিয়ে এসেছেন তাঁদের কাছে ও উপস্থিত জনতার কাছে জিজ্ঞাসাবাদে যা জানতে পারলাম তা হ'ল এরূপ—যখন লোকজন গুণ্ডাদের ধাওয়া করতে করতে কারখানার কাছে পৌঁছন তখন কারখানার

ভিতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন। এমন সময় কারখানার গুণ্ডারা আগ্নেয়াস্ত্র যেমন পাইপগান, বন্দুক, ধারালো তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করে। এ সময় তাঁরা দেখতে পান কারখানার গুণ্ডাদের বন্দুকের গুলিতে কয়েকজন গ্রামবাসী মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। এদের যারা তুলে আনতে যান তাঁরাও গুলিবিদ্ধ হন। এর পরে নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসেন।

অনেক পরে জলপাইগুড়ি থেকে জেলা প্রশাসনের ও পুলিশের কর্তারা রাজগঞ্জে এসে কমিটির সভাপতি ও সহসভাপতির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সভাপতি শ্রী শিশির লাহিড়ী দাবী তোলেন (ক) যারা রাজগঞ্জ বাজারে কৈলাশকে অত্যাচার করে ঘটনার সূত্রপাত করল তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। (খ) এস এস মারোয়ার নেতৃত্বে যে পোষা গুণ্ডারা সাধারণ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর বেআইনী বন্দুক চালিয়ে তাদের আহত করেছে অবিলম্বে সেই গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু আলোচনা সেদিন ফলপ্রসূ হয় নি। প্রশাসন জানায় 'মালিকের লোকেরা গুলি চালায় নি। গ্রামবাসীরা পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন।'

পরের দিন 19.12.91 তারিখে কারখানার গুণ্ডাদের গুণ্ডাবাজী ও গুলি চালনার প্রতিবাদে সমস্ত রাজগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। সেদিন জলপাইগুড়ি থেকে অধ্যাপক জয়দেব মণ্ডল ও অনেকে ছুটে আসেন। জলপাইগুড়ি থেকে খবর পাই বন্দুকের গুলিতে আহতদের এক্স-রে রিপোর্টে ছর্‌রা পাওয়া গেছে। এ খবর নিয়ে অধ্যাপক জয়দেব মণ্ডলের নেতৃত্বে একটা টিম রাজগঞ্জ থানায় ডি এস পি হেড কোয়ার্টার্স-এর সঙ্গে ছর্‌রা প্রসঙ্গে কথা বললে তিনি প্রতিনিধিদের জানান যে, আজকাল পুলিশ ছর্‌রা গুলি ব্যবহার করে। এদিকে জলপাইগুড়ির এস পি মহাশয় ঘটনার সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে বিকাল 5টা নাগাদ থানায় উপস্থিত হন। অধ্যাপক মণ্ডল তাঁর সঙ্গে দেখা করে উক্ত ছর্‌রা প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, পুলিশ ছর্‌রা ব্যবহার করে না।

এই মূল ঘটনাকে বিকৃত করে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বিবৃতি দিলেন—

(1) কারখানায় পাহারারত পুলিশের উপর ইঁট পাটকেল ছোঁড়া হয়েছিল অথচ কারখানায় অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ির এইচ / সি 732 সফিরুল হক রাজগঞ্জ পি এস কেস নং 131/31, তারিখ 18.12.91-তে বলেছেন উচ্ছৃঙ্খল জনতা আমাদের দিকে বোমা ছুঁড়তে থাকে ও গুলি ছুঁড়তে থাকে।

(2) কারখানায় অবস্থিত ফাঁড়ির পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ করে তার পরে কাঁদানে গ্যাস। এর পরেও কাজ না হলে পুলিশ গুলি চালায়। কিন্তু 131/91 এফ আই আর-এ লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের উল্লেখ নেই। সরাসরি গুলি চালাবার কথা বলেছেন এবং তার হিসাব দিয়েছেন—কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটালে তার হিসাব নেই কেন?

(3) স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁর বক্তব্যে বলেছেন কারখানার শ্রমিকদের শিশু ও মহিলারা বোমার আঘাতে ও ইঁটের আঘাতে আহত হয়েছেন। কিন্তু 131/91 এফ আই আর-এ তার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া নিকটবর্তী কালীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মকড়াডাঙ্গি ও জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি কারখানার এ ধরনের কোন রোগী এমন কি পুলিশ কর্মী কেউ ভর্তি নেই।

(4) শ্রী গুপ্তের মতে এস ইউ সি আই, কংগ্রেস (আই), সি পি আই দলের কর্মীরাই কারখানা ধ্বংস করতে গিয়েছিল। কিন্তু মনীশবাবুর বক্তব্য এ জন্যই অসত্য যে গোটা রাজগঞ্জ এলাকাতে সি পি আই দলের কোন অস্তিত্বই নেই। এমন কি জেলা স্তরেও সি পি আই এই আন্দোলনে নেই। এ ছাড়া যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা কেউ কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা নন।

(5) শ্রীগুপ্ত আরো বলেছেন ঐ রাতে (18.12.91) কারখানার পাশ থেকে পুলিশ 20 জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণ সে রাতে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

(6) এ ঘটনার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন প্ররোচনা নেই—এই ছিল মনীশবাবুর উক্তি। কিন্তু তা কখনই সত্য নয়। 130/91 এফ আই আর-এ উল্লেখ আছে যে, কারখানার লোকেরাই ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে গ্রামবাসীদের প্রথম আক্রমন করে। যেটা সেদিনের ঘটনার সূত্রপাত। আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না, কোন অজ্ঞাত কারণে মাননীয় মনীশবাবু 130/91 রাজগঞ্জ কেসটার কথা এবং কারখানার গুণ্ডাদের গুলি চালনার ঘটনা গোপন রাখছেন। তাঁর এই রহস্যময় আচরণ সমস্ত রাজগঞ্জবাসীকে ভাবিয়ে তুলছে। এর পরেও জেলা প্রশাসনের কর্তারা থেমে নেই। আমি সেই রাত্রে দুটো ঘটনার সময় উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধে দশটা জামিন অযোগ্য ধারা দিয়ে রাজগঞ্জ পি এস কেস নং 131/91 তারিখ 18.12.91 ইউ এস 147/148/149/448/323/427/436/336/353/307 আই পি সি এফ আই আর করেন। যেহেতু কারখানার বিরুদ্ধে আন্দোলনের দায়িত্ব আমি বহন করি, তাই আমাকে হেনস্থা করার জন্য এই ষড়যন্ত্র। সেদিন থানায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পুলিশের কর্মকর্তাদের পরামর্শে আমার একার বিরুদ্ধে এই কঠিন আক্রমণ। কিন্তু আমি বিচলিত নই। আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

বিনীত

শ্রীঅরুণ বর্মণ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের। সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ৩৯৮৩/৯১

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্
এখন যা ঘটছে

হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে চড়ে শ্রীরামপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে পড়বে সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলোয় উজ্জ্বল এক ফ্লাই-ওভার (উড়াল পুল)। আর ঠিক তার আগেই বাঁদিকে তাকালে দেখবেন ধোঁয়া জড়িয়ে থাকা রাতের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্। তার দরজার তালা আজও বন্ধ। 30 মে যে শ্রমিকরা মালিকদের অন্যায়ভাবে কারখানায় তালা লাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ আট মাসের ভয়ঙ্কর কালো অভিজ্ঞতা তাঁদের ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। পাঁচ বছরে পনের কোটি টাকা (1982-1987) সরালো যারা, সেই মালিক সারাভাইদের কোন শাস্তি আজও হয় নি। পাশাপাশি তিনটে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন আর 'বাঁচাও কমিটি'তে ভাগ হয়ে থাকা শ্রমিকদের এক জায়গায় জড়ো হওয়া আজ বোধহয় খুবই কঠিন কাজ।

'বাঁচাও কমিটি' লড়ছে ঃ

না, খুব বেশী শ্রমিক কমিটিতে নেই। আর থাকবেনই বা কি করে? ঝাণ্ডা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে পেট তো মানবে না। এদিক-ওদিক কিছু রোজগারের চেষ্টা তো করতেই হবে! তবু 'বাঁচাও কমিটি' চেষ্টা করছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা করছে। বন্ধুদের সাহায্যে কুপন বিক্রি করে টাকা তুলছে। চেষ্টা করছে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা যাতে সবাই তুলতে পারে। 29 অক্টোবর এই উদ্দেশ্যে তারা এক লিফলেটও প্রকাশ করে। ওই একই দিনে প্রকাশিত অন্য এক লিফলেটে 'বাঁচাও কমিটি' 'শ্রমিক-সমবায়' গড়ার দাবীও তুলে ধরে।

বি আই এফ আর কি করছে?

1 আগষ্ট '91 বি আই এফ আর রাজ্য সরকারকে তিন মাস সময় দিয়েছিল ওপেককে চাঙ্গা করে তোলার পথ ঠিক করার জন্য। 28 অক্টোবর ওই সময়সীমা পার হয়ে গেল। অথচ রাজ্য সরকার কিছুই ঠিক করতে পারল না। এই অবস্থায় গত 15 নভেম্বর বি আই এফ আর ওপেক ইনোভেশনস্ লিমিটেডকে তুলে দেবার কথা বলতে শুরু করেছে। ঠিক হয়েছে 10 ফেব্রুয়ারী '92 এ ব্যাপারে বি আই এফ আরের সামনে কথাবার্তা হবে। আর এই অবস্থাতেই 'বাঁচাও কমিটি', বিভিন্ন গণ বিজ্ঞান, নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলো একযোগে অভিযোগ জানালেন এম আর টি পি কমিশনের সামনে।

এম আর টি পি কমিশন ঃ

মনোপলি এ্যাণ্ড রেষ্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাক্টিসেস কমিশনের ক্ষমতা আছে বছরে 20 কোটি টাকার বেশী ব্যবসা করে এমন সংস্থাগুলোর ওপরে খবরদারি করার। এম আর টি পি আইনের সংশোধিত ধারাগুলোর জোরে কমিশন দু দিক থেকে কোম্পানীদের অপরাধ ধরতে পারে। একটা কোম্পানী ভেঙে দুটো করলে তা কমিশনের অনুমতি নিয়ে করতে হয়। স্পষ্টতঃই সারাভাইরা এখানে আইন ভাঙার দায়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি যারা পেনিসিলিন ট্যাবলেট কিনবে তাদের স্বার্থের দিক থেকেও মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যায়। এই দুই কারণেই আম্বালাল সারাভাই এণ্টারপ্রাইজেস্ লিমিটেড, সিনবায়োটিক্স লিমিটেড ও ওপেক ইনোভেশন্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে 7 জানুয়ারী '92 তারিখে। আর পরের দিন অর্থাৎ 8 তারিখ বি আই এফ আরকে পৌছে দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ পত্রের কপি। আবেদন করা হয়েছে এক্ষুণি এক্ষুণি ওপেক গুটিয়ে নেবার চেষ্টা বন্ধ করতে—যেহেতু বিষয়টি এখন এম আর টি পি কমিশনের সামনে রয়েছে।

দাবী উঠছে—সারাভাইদের চুরি ধর ঃ

13 জানুয়ারী মাদ্রাজে সারাভাই গ্রুপের মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য। এই সভা ডাকা হয়েছিল ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল এ্যাণ্ড সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ্স অ্যাসোসিয়েশনস অফ ইণ্ডিয়া (এফ এম আর এ আই)-র তরফ থেকে। নানান অঞ্চল থেকে আসা ফিল্ড ওয়ার্কাররা (যাঁদের মধ্যে সরাসরি স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্-এর লোকেরাও আছেন) জোরাল দাবী তোলেন যে 28 ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাঁদের পাওনা টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিতে হবে নয়ত 2 মার্চ থেকে তাঁরা আন্দোলনের পথে যাবেন। এটা খুবই ন্যায্য দাবী। কিন্তু এই দাবীতেই তাঁরা নিজেদের আটকে রাখেন নি। সভার প্রধান দাবী হল—সারাভাই গোষ্ঠি যেভাবে টাকা তছরূপ করে, আইন ভেঙে এস পি ওপেক বন্ধ করে দিয়েছে তার খোলাখুলি তদন্ত হোক। এই উদ্দেশ্যে ওই দিনই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা হয়েছে এবং চিঠির কপি অন্যান্য মন্ত্রীদেরও দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি সভার বক্তব্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ম্যানেজমেণ্টকেও।

সারাভাইরা কি বলছে ?

20 জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই অফিসার গিয়েছিলেন আহমেদাবাদ। এস-পি-ওপেকের ভবিষ্যৎ নিয়ে সারাভাইদের সাথে সরাসরি কথা বলতে। শিল্পপতি গৌতম সারাভাইয়ের সাথে তাঁদের কথা হয়েছে। এবং এর মারফতই জানা গেছে এস পি-ওপেক খোলার ব্যাপারে সারাভাইদের অ্যাকশন প্ল্যানের কথা।

এস পি

এস পি তে অফিসার-শ্রমিক মিলিয়ে কর্মী সংখ্যা 409 জন। তাঁদের মধ্যে 148 জনকে ছাঁটাই করা হবে। হিসেবটা এই রকম—

	শ্রমিক সংখ্যা	অফিসার সংখ্যা
এখন	379	30
ছাঁটাই হবে	142	6
থাকবে	237	24

ওপেক

ওপেকে অফিসার-শ্রমিক মিলিয়ে কর্মী সংখ্যা 919 জন তাঁদের মধ্যে 719 জনকে ছাঁটাই করা হবে। হিসেবটা এই রকম—

	শ্রমিক সংখ্যা	অফিসার সংখ্যা
এখন	810	109
ছাঁটাই হবে	644	75
থাকবে	166	34

এস পি এবং ওপেক উভয় জায়গাতেই উৎপাদন শুরুর খরচা সারাভাইরা দেবে। কিন্তু কর্মীদের বেতন বা অন্যান্য বকেয়া পাওনার ব্যবস্থা করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। পাশাপাশি বিদ্যুতের বিল, বকেয়া কর, এ সবের জন্য আপাতত ছাড় দিতে হবে। এক্ষুনি বিদ্যুত সরবরাহ চালু করতে হবে। লেভির দরে কারখানাকে চিনি সরবরাহ করতে হবে, ইত্যাদি।

সারাভাইরা চায় এই পরিকল্পনাটিই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বি আই এফ আর এর সামনে পেশ করুক।

ওপেকের ডাইরেকটার ও পি খান্নার সই করা এই খসড়া (পরিবর্তিত) প্রস্তাবটি সারাভাইরা 1 ফেব্রুয়ারী কলকাতায় এস পি-ওপেকের স্বীকৃত চারটি ট্রেড ইউনিয়নকে দিয়েছে বিবেচনার উদ্দেশ্যে।

অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে ঃ

জনস্বাস্থ্য ও জনবিজ্ঞান উদ্যোগগুলির পক্ষ থেকে দাবী ছিল যে অবিলম্বে সাধারণ মানুষের স্বার্থে শ্রীরামপুরে পেনিসিলিন উৎপাদন শুরু হোক। কিন্তু এ প্রশ্ন উঠবেই যে এর জন্য কি দাম কর্মীরা দেবে? 919 জনের মধ্যে 719 জন ছাঁটাই! নিষ্ঠুরতার তো একটা সীমা আছে। সারাভাইদের প্রস্তাবটা ভাল করে দেখুন। সেই পুরোন কায়দা। —উৎপাদনের খরচা আমরা দেব। সরকার ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে কর্মীদের বেতন মেটাক। করে ছাড় দিক্। এখনই ইলেকট্রিকের বিল যেন না দিতে হয়। আর এসব না মানলে আমরা কারখানা বেচে দিতে রাজী আছি। তবে যোগ্য দাম পেলেই। —অর্থাৎ সারাভাইরা এখান থেকে আরও টাকা বের করে নিয়ে যেতে চায়। তাই 5 ফেব্রুয়ারী রাজ্যের বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে স্পষ্টভাবেই যৌথ আন্দোলনের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে যে এস পি আর ওপেককে এক করে হয় সরকারী তত্ত্বাবধানে চালানো হোক, নয়ত শ্রমিক সমবায় গড়ে সংযুক্ত কারখানাকে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। সারাভাইদের এস পি-ওপেক থেকে হঠাতেই হবে।

কিন্তু দাবী যাইই উঠুক তার পিছনে ইউনিয়নের গণ্ডী ছাপিয়ে সব শ্রমিকের একজোট হয়ে দাঁড়ানো আজ খুব জরুরী।

এমনিতেই তো পেটের জ্বালা মেটাতে ডালা নিয়ে রাস্তায় বসা শ্রমিকরা কারখানা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য। আর এই মানুষরাই যদি না নিজেদের স্বার্থে নিজেরা উঠে দাঁড়াতে পারেন তবে 'বাঁচাও কমিটি' হোক কি প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন ইউনিয়নই হোক—কেউই সম্পূর্ণ পরাজয়ের হাত এড়াতে পারবে না।

Space Donated By

K. BANERJEE AND BROTHERS

(Civil Engineers)

P-291, C I T ROAD, Scheme No. IV (M)
CALCUTTA-700 085

দশ বছরে 'মানস'

মনের অসুখে ভুগছেন এমন মানুষদের জন্য গড়ে উঠেছিল 'মানস', কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে। যাদের বাড়ীতে অথবা পরিচিতের মধ্যে রয়েছেন এমন অসুস্থজন। সেই 'মানস'-এর দশ বছর পূর্ণ হল '91 সালে। স্বভাবতঃই খুশি 'মানস'-এর বন্ধুরা। এবং আমরাও।

মনোরোগের চলতি চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল সকলেই জানেন কি অপ্রতুল এবং অমানবিক এই ব্যবস্থা। অথচ অসুখটা তো মনের! তাই ভুক্তভোগী ক'জন বন্ধু ভাবলেন—একটু অন্যভাবে কিছু করা যায় না? যেখানে নিছক লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ খাওয়ানো নয়—মন নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করা যায়। গল্প-আড্ডা, খেলাধূলা, গান-বাজনার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের চৌহদ্দিতে টেনে আনা অসুস্থ মানুষটিকে।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই জন্ম 'মানস'-এর। খুব বড় কিছু নয়। আশা ছিল—অন্তত চেনা পরিচিতের গণ্ডীতে রয়েছেন যাঁরা—সেই বন্ধুবান্ধব, তাঁদের আত্মীয়স্বজন—এঁদেরকে নিয়েই গড়ে উঠবে 'মানস', 'মানস'-এর পরিচালন ব্যবস্থা। চলতি সমাজের ঝড়-ঝাপ্‌টায় বিপর্যস্ত, অবহেলিত, অনাদৃত মানুষজনদের সংগঠন হয়ে উঠবে 'মানস'।

ভাবনা এক, আর তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অন্য। ফলে একটুখানি আস্তানা জোটাতেই কেটে গেছে অনেকদিন। অবশেষে এগিয়ে আসেন একজন শিক্ষক। ঠাঁই মেলে তাঁর স্কুল বাড়ীতে। পার্ক সার্কাসের মডার্ণ স্কুলে। সপ্তাহে দুদিন। ছুটির শেষে ক্লাশ ঘরে শুরু হয় 'মানস' ক্লিনিক এবং কাউন্সেলিং সেন্টার। বয়স্ক দুজন চিকিৎসক এবং বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চলে ক্লিনিক। এর মধ্যে টেকনিক্যাল লোক আছেন যেমন, তেমনি নিছক শুভানুধ্যায়ীও আছেন। অনেকে আসেন সপ্তাহের শেষে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে সেই আশাতেও। এরই মধ্যে চলে টেপ চালিয়ে গান, ক্যারাম খেলা বা অনেক সময় গলা মিলিয়ে গান। আর মাঝে-মধ্যে বসে বিশেষ প্রদর্শনী বা গানের আসর। এবং বছরে একবার সবাইকে নিয়ে পিকনিক। গোটা ব্যাপারটাই উপস্থিত বন্ধুদের নিজেদের উৎসাহ এবং সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে চলেছে এ পর্যন্ত। এখানে উৎসাহের ওঠা-পড়ার সাথে তাল মিলিয়ে এসমস্ত প্রোগ্রামেও এসেছে জোয়ার-ভাঁটা।

যত ছোটই হোক ক্লিনিক চালাতে তার অনুষঙ্গ হিসেবে লাগে বই-খাতা-ফাইল-ওষুধপত্র ইত্যাদি। সেগুলো স্কুলে রাখা যায় না। ফলে রোজ প্রায় এক ট্রাঙ্ক জিনিষপত্র স্কুলে বয়ে আনা আবার হাতে হাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। —এই ভাবে চলছে দীর্ঘ দশ বছর। চলছে ভালবাসার টানেই। বন্ধুদের স্বেচ্ছাশ্রম ও আর্থিক অনুদানে।

দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সহমর্মী সংগঠন ও বন্ধুদের একত্রে জড়ো করেছিলেন 'মানসে'র বন্ধুরা একটি আলোচনা সভায়। গত 20 নভেম্বর। বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের সভাকক্ষে। আলোচনার বিষয় ছিল 'সোসাল সাইকিয়াট্রি'। এতে বক্তব্য রেখেছেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন চিকিৎসক, সমাজসেবী স্বাস্থ্যকর্মী ও 'মানস'-এর বন্ধুরা। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে—একটি সুদৃশ্য স্মারক পত্রিকা।

ক্লিনিক : প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে ছ'টা
মডার্ণ স্কুল-এর একতলায়
17বি মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড
কলকাতা-700017

ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা : 'মানস'
অমল সোম
পি 239 এ কিষ্বার ষ্ট্রীট
কলকাতা-700017

HUMAN JUSTICE

A Non-Commercial Quarterly Journal on
Legal Struggle for Human Rights
to be published soon

To report legal struggles against state repression and torture in any part of India

We seek
Financial Support From Concerned People

Contact Address

SAUMEN GUHA
LD/5 KUSTHIA HOUSING ESTATE
CALCUTTA-700 039

নাগরিক মঞ্চের পরবর্তী প্রকাশনা

★ **পাবলিক সেকটর** দাম—৮ টাকা (সম্ভাব্য)

★ **পাট—পাট শিল্প—একটি সমীক্ষা**

নাগরিক মঞ্চ গত তিন বছর যাবৎ বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের প্রচারে, আইনী বিষয়ে ও বিভিন্ন সংগ্রামে সাধ্যমত সহযোগিতা করছে। বর্তমানে ভয়ঙ্কর রকমের আর্থিক সংকটের জন্য আমাদের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। তাই আমরা শুভানুধ্যায়ী সাথী বন্ধুদের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন রাখছি।

নাগরিক মঞ্চ, ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলি-৮৫
রুম নং ৭, ব্লক বি।

কুচ কাওয়াজের মর্মবাণী

পুরুষ, রমণী এবং শিশুরা।
বয়োজেষ্ঠা নাগরিকগন এবং
স্বাধীনতার প্রহরীগন।
প্রজাতন্ত্র দিবসে তারা যখন
সগর্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কুচ কাওয়াজ করেন
তখন তাদের মনে কেবল মাত্র
একটি অনুভূতির ঝঙ্কার–
ভারত–আমাদের ভারত।

আর যে সমস্ত লক্ষলক্ষ জনগন, যারা
এই কুচ কাওয়াজ দেখেন তাদের মনের মধ্যেও
কেবল সেই একটি মাত্রই ভাবনা–
একাত্মবোধের ভাবনা।

আর এই ভাবনাটি আরো সুদৃঢ় হয়ে
ওঠে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে– তা সে
চ্যালেঞ্জ কোন অর্থনৈতিক বা অন্য কোন
ধরনের– যাই হোক না কেন। ফলশ্রুতিতে
দারিদ্র দূরীকরণের সংগ্রামে এবং নতুন নতুন
পথে এগিয়ে যেতে আমাদের প্রচেষ্টাকে
আরো বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তোলে।

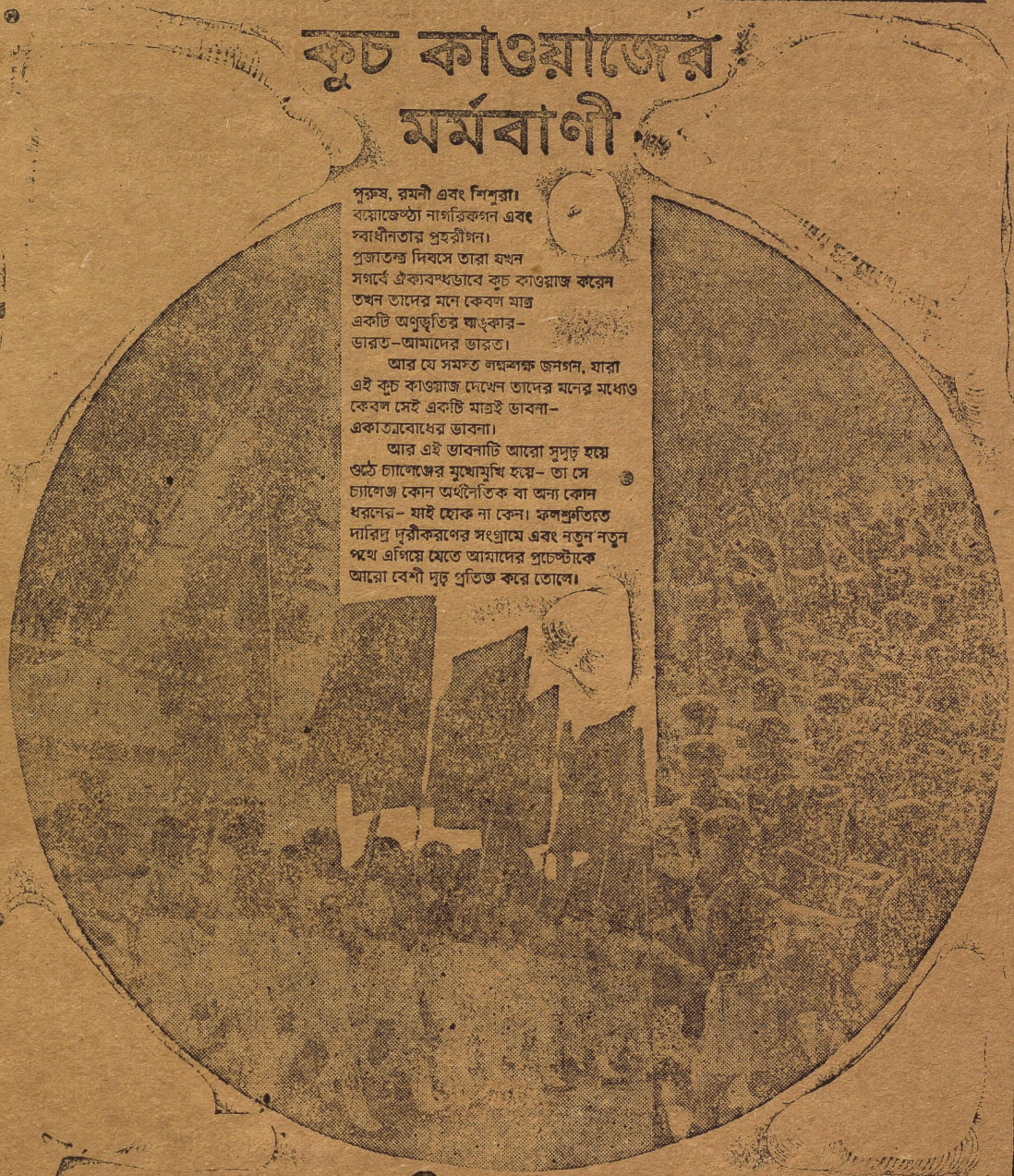

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জয়লাভের সংকল্প–
সেটাই হচ্ছে কুচ কাওয়াজের মর্মবাণী

davp 91/600 Ben.

R. N. 34929/79
YEAR 14, NUMBER 6

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C'o A. Lahiri
B2 Baisakhi, 153/1 Jessore Road, 700074
May-June, 1991

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ

বাঙালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫ টাকা
বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন	১৫ টাকা
বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮ টাকা
কলকাতা তিনশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর	১২ টাকা
ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার	৮ টাকা

জীবনীগ্রন্থমালা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫ টাকা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত	২ টাকা
রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত	৮ টাকা
সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত	৩ টাকা
সুকুমার : লীলা মজুমদার	১৪ টাকা
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত	১০ টাকা

সংকলনগ্রন্থ

সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত	৩০ টাকা
প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ	৪৫ টাকা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ	৫০ টাকা

মুখপত্র

আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্য কেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০
ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দে বুক স্টোর, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্রনস্কর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১০

আই সি এ ৩২৮৩/৯১

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক বিশ্বাস প্রিন্টিং হাউস, 130 কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700009 থেকে মুদ্রিত।